রাজপুত রমণীর কেশসজ্জা - লক্ষ্মী মন্দিরের দেওয়ালচিত্র, ওরছা - আলোকচিত্রী পৃষতী রায়চৌধুরী

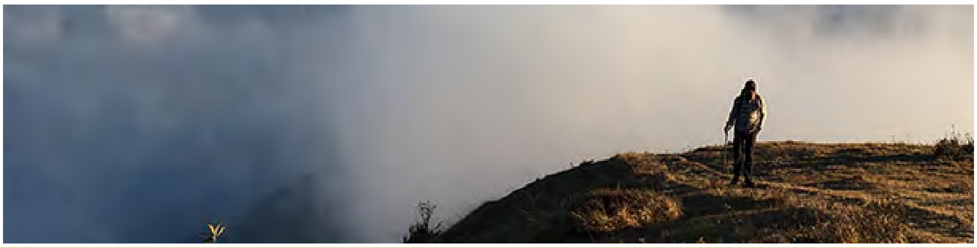

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
পৌষ - চৈত্র ১৪২৮

প্রায় বছর দেড়েক পরে গত ডিসেম্বরের শীতে শেষপর্যন্ত বেরিয়েই পড়লাম দুজনে হঠাৎ করেই। গন্তব্য সুন্দরবন। জলে-জঙ্গলে দুটো দিন কাটানোর গল্প লিখবো আগামী সংখ্যায় 'আমাদের ছুটি'র পাঠকদের জন্য। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে চোখাচুখি না হলেও সঙ্গ দিয়েছিল বিভিন্ন প্রজাতির মাছরাঙা, কাদাখোঁচা, বক, শঙ্খচিল, পরিযায়ী হাঁসসহ নানান পাখি, হরিণের পাল, বাঁদর, কুমীর, ভোঁদড় আমাদের এই নীল-সবুজ গ্রহের নানান সহবাসিন্দারা। তবে সুন্দরবনের আসল সৌন্দর্য তার নদী আর অরণ্য। তাকে দুচোখ ভরে আর হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে করতে সময় যে কখন কেটে যায় খেয়ালই থাকে না।

এবারে ধীরে ধীরে বেশ কিছুটাই শিথিল হচ্ছে লকডাউনের কড়াকড়ি, খুলছে স্কুলকলেজও। আশা করা যায় আপনারা আবার অবসর সময়ে বেরিয়ে পড়তে পারবেন জানা-অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে। আর ফিরে এসে সেই বেড়ানোর লেখা পাঠিয়ে দিন 'আমাদের ছুটি'র দপ্তরের ই-মেইল-এ।

সকলেই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ এই সংখ্যায় ~

"ভাবতে খুবই অবাক লাগছিল যে নুড়ি মেশানো বরফের ওপর দিয়ে একটু আগেই আমরা হামাগুড়ি দিয়েছি, শরীরটাকে কোনো রকমে টেনে হিঁচড়ে ওপরে তুলেছি আর তারপর হেঁটেও বেরিয়েছি তার থেকেই কি না তৈরি হয়েছে আস্ত একটা নদী - নন্দাকিনী!"

সুদীপ্ত দত্তের ট্রেকিং-এর কাহিনি "নন্দাকিনীর উৎসমুখে"র শেষ পর্ব

~ আরশিনগর ~

অরণ্যের দিনরাত্রি – তাপস মণ্ডল

ট্রেক ডায়েরিঃ সান্দাকফু- ফালুট – সুদীপ্ত ঘোষ

~ সব পেয়েছির দেশ ~

বেত্রবতী নদীতীরে উপেক্ষিতা ওরছা – পৃষতী রায়চৌধুরী

পুরী থেকে পশ্চিমে সাতপদায় – তপন পাল

গঙ্গোত্রী- গোমুখ – পারমিতা মুখোপাধ্যায়

কনকচৌরির কার্তিক মন্দির – অরিন্দম পাত্র

~ ভুবনডাঙা ~

কামাল পাশার শহরে – তপতী সাহা

এস্টোনিয়ায় একদিন – সৌমিত্র বিশ্বাস

~ শেষ পাতা ~

রূপনারায়ণের কূলে শরৎ কুঠি
– বাপ্পাদিত্য বর্মন

রূপনারায়ণের কূলে - আলোকচিত্রী বাপ্পাদিত্য বর্‌মন

For any queries/complaints, please contact amaderchhuti @gmail.com
© 2011 - 2022 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

নন্দাকিনীর উৎসমুখে

সুদীপ্ত দত্ত

~ রন্টি স্যাডল ট্রেক রুটম্যাপ || রন্টি স্যাডল ট্রেকের আরও ছবি ~

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

নন্দাকিনীর উৎস ও রন্টি স্যাডল

রাতে আর ঘুম হল কই? হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় রাতের অন্ধকারেই নিয়ে নিতে হল রন্টি অভিযানের প্রস্তুতি। ঘড়ির কাঁটায় তখন পাঁচটা দশ,রওনা হয়ে গেলাম অন্ধকার পাথুরে পথ ধরে। রাতের অন্ধকারে পাহাড়ি ছাগলের উপস্থিতি মাঝেমাঝেই টের পাওয়া যাচ্ছে। মাথায় একটা হেডল্যাম্প লাগিয়ে এবড়োখেবড়ো পথে হোঁচট খেতে খেতে চারজনে জোট বেঁধে এগোতে লাগলাম। গাইড আনন্দ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আর পোর্টার বিনোদ দলের পেছনে থেকে আশেপাশের সমস্তরকম বিপদের দিকে নজর রাখছিল। ঘন্টাখানেক এভাবে চলার পর আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগল। সেই আলো-আঁধারিতে সামনের যে পথ চোখে পড়ল তার বিবরণ ভাষায় বোঝানো বেশ কঠিন। অনেকটা ডাইনোসরের পিঠের মতো একটা পাহাড় সামনের দিকে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে গেছে আর তার পিঠের ওপর দিয়ে যে চলার পথ রয়েছে তা এতটাই সরু যে একটা পায়ের পাশে অন্য পা'টি ফেলা খুবই কঠিন। পুরো পাহাড়টাই অনেকটা কাঠকয়লার ছাইয়ের মত ধূসর রঙের পাথরকুচি দিয়ে তৈরি, আর সেই পাথরের ওপর পা রাখলে মাঝে মাঝেই তা গড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে পড়ছে।

'ডাইনোসরের পিঠ'এর দুপাশেই খাড়া ঢাল নিচে নেমে গেছে দুটো গিরিখাতের দিকে। এর মধ্যে একটা গিরিখাতে বয়ে চলেছে নন্দাকিনী নদী, অন্য গিরিখাতটা আপাতত শুকনো হলেও দুটোই আসলে একই নদীর খাত। এই গিরিখাতের

অন্যমনস্ক হয়ে পা ফেললেই যে গড়িয়ে যেতে হবে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। ঘন্টাখানেক ধরে সেই সরু রাস্তা দিয়ে এগোতে এগোতে একসময় তা ঢালু হয়ে এক সমতলে এসে মিশল। সমতল জমির একপাশে ছোট্ট এক মন্দির দেখতে পেলাম, আর এই নির্জনেও দেখতে পেলাম কয়েকজন হাই-অল্টিচিউড পোর্টারের উপস্থিতি, কোনও অভিযাত্রী দলের মালবাহক হয়ে ওঁরা এসেছেন এই দুর্গম পথে।
সমতলে পৌঁছানোর ঠিক মুখে একটা সরু নালা পেরোতে হল, এই নালাটাই নন্দাকিনী নদীর উৎস। সরু নালার মতো নন্দাকিনী এসে মিশেছে সমতল এই জমিতে এবং পুরো জমিটাই ঢেকে গেছে সাদা জমাটবাঁধা বরফে। এই বরফেঢাকা সাদা জমিটাই পবিত্র হোমকুণ্ড - স্থানীয় ভাষায় হোমকুনি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বরফঢাকা জমিই লেকের আকার নেয় আর সেখান থেকেই বয়ে চলে খরস্রোতা নন্দাকিনী। পুরো অঞ্চলটা পাহাড়ে ঘেরা আর তাদের বেশ কয়েকটি থেকে নেমে এসেছে ভয়ালদর্শন হিমবাহ। মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মন্দিরের চালাটা তামা বা ওই জাতীয় চকচকে লাল রঙের কোনও ধাতুর তৈরি। যশবন্ত সিং নামক এক ভক্ত কিছুদিন আগে এই মন্দিরটি বানিয়েছেন। কাছাকাছি লেকের ঠিক পাশেই আরো একটি পাথরের তৈরি ছোট মন্দির দেখতে পেলাম, এটি দেবী শেরওয়ালীর মন্দির। এটি বেশি পুরানো, এখনও নিয়মিত পুজো হয় এখানে।

প্রতি বারো বছর অন্তর এক মস্ত মেলা বসে হোমকুণ্ডে, দূরদূরান্ত থেকে এসে অসংখ্য পুণ্যার্থী দেবতার উদ্দেশ্যে পূজার দান উৎসর্গ করে যায়। এই উৎসবকে বলা হয় 'বড়া নন্দা যাত' বা 'নন্দাদেবী রাজ যাত্রা'। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই প্রথা প্রায় হাজার বছরের পুরানো হলেও তা বাইরের জগতের লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গিয়েছিল,বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিভিন্ন পর্বত অভিযান ও সার্ভের সময় এই অজানা-অচেনা জগৎ ব্রিটিশদের নজরে আসে। জুনারগলি বা শিলা সমুদ্রের মত এখানে উচ্চতানির্দেশক কোনও সাইনবোর্ড চোখে পড়ল না,তবে ইন্টারনেট ঘেঁটে যেটুকু জেনেছিলাম এখানকার উচ্চতা চার হাজার মিটারের আশেপাশে হবে। হোমকুণ্ড থেকে অভিযাত্রীরা নন্দাঘুন্টি অভিযানে রওনা দেন,এখানেই তৈরি হয় ওঁদের বেস ক্যাম্প।
কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম হোমকুণ্ডে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মানবদার শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাবুদাও পায়ের ফোস্কা নিয়ে চলাফেরায় খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না। কুণ্ডের একপাশে উঁকি মারছে রন্টি স্যাডল, আমাদের লক্ষ্য যে সেখানেই। কিন্তু মানবদা আর বাবুদা স্যাডল পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে এখান থেকেই আবার দোদাং ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আমি আর ক্যাপ্টেন সুখেনদা স্যাডল পর্যন্ত পৌঁছানোর একটা চেষ্টা করে দেখব বলে স্থির করলাম। মানবদা আর বাবুদা আমাদের শুভেচ্ছা জানাল যাতে সফল হতে পারি। স্যাডলের ওপরের ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানবদার মাফলারটা চেয়ে নিলাম। সকাল তখন সাড়ে সাতটা, রওনা দিলাম স্যাডলের পথে।

হোমকুণ্ডের নতুন মন্দিরের পাশ দিয়ে লেকের ঠিক উলটোদিকে একটা নুড়ি-পাথরের ঢাল ওপরের দিকে উঠে গেছে। প্রথমে আনন্দ আর ক্যাপ্টেন এবং তার পেছন পেছন আমি আর বিনোদ সেই ঢাল বেয়ে এগিয়ে চললাম। কিছুটা এগোতেই নুড়ি-পাথরের জায়গা নিল বড় বড় বাদামি-সবুজ রঙের বোল্ডার। যত এগোতে থাকলাম চলার পথ ততই সরু হতে থাকল। আকাশনছোঁয়া উঁচু উঁচু বাদামি পাহাড়ের সারি সরু পথের দুপাশে যে দেওয়াল তৈরি করেছে তা টপকে ওপাশের জগতকে কল্পনায় আনাও একপ্রকার অসম্ভব। অনুসরণ করার মতো একটা খুব সরু পায়েচলা পথ বোল্ডারের ওপর নজরে পড়ল, সেটি ধরেই চড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। এতটা চড়াই পথে চলতে দমে কিছুটা ঘাটতি হতে শুরু করল। ক্যাপ্টেন মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স পাস করা অভিযাত্রী, একজন রক ক্লাইম্বিং প্রশিক্ষকও বটে। আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে তরতর করে ওপরে উঠে মুহূর্তে চোখের আড়ালে চলে গেল। কিছুটা পথ যাওয়ার পর বোল্ডার জোনও শেষ হয়ে এল। সামনে তাকিয়ে দেখলাম স্বচ্ছ বরফেঢাকা এক নুড়ি-পাথরের চড়াই, আর এতক্ষণ ধরে পথ দেখানো সেই সরু পায়েচলা রাস্তাও আমায় একলা রেখে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল! পথ খুঁজে পাওয়ার আশায় সামনের দিকে তাকালাম।

সামনের পথের পুরোটাই শক্ত পিছল বরফে ঢাকা, তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলা একপ্রকার অসম্ভব। বরফের ওপর দিয়ে চলার জন্য জুতোর নিচে একধরনের ধাতুর তৈরি কাঁটা বা ক্র্যাম্পন রবারের ফিতে দিয়ে বেঁধে নেওয়া হয়, কিন্তু এই যাত্রায় আমরা তা সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। অন্য কী উপায় নেওয়া যায় তার খোঁজ করতে করতে সামনের বরফের জরিপ করতে থাকলাম। স্বচ্ছ বরফের স্তর বেশ কিছুটা ওপরে উঠে সরু হয়ে দুধসাদা তুষারের একটা আঁকাবাঁকা সর্পিল রেখা তৈরি করেছে। নুড়িপাথর আর বড় বোল্ডারের দুটো ধাপ থাকায় এই বরফের রেখাটি খুব কাছের হোমকুণ্ড মন্দির থেকে দেখা যায় না কিন্তু দোদাং,ঘিউথাপ্পান এমনকি কালো বিনায়কের মন্দির থেকেও দেখতে পাওয়া যায়।বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাস্তা খুঁজতে থাকার পর বিনোদ পাশে এসে দাঁড়াল। পিছল বরফের ওপর দিয়ে সরাসরি হাঁটা না গেলেও তার বাঁদিকে

পাথরকুচির ওপর পা ফেলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনেক কষ্টে হাঁচোড়পাঁচোড় করে যতটা ওপরে উঠি একটু পড়েই আবার গড়িয়ে আগের জায়গায় নেমে আসি,অনেকটা সেই তেলমাখানো বাঁশের অঙ্কের মতো! এই গড়ানো পাথর দুপাশে পাহাড়ের দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথরে ধ্বস নামার সম্ভাবনাও বাড়তে থাকে,আর সত্যিই যদি একবার সেরকম কিছু ঘটে তাহলে... আর ভাবতেই ইচ্ছে করল না। বারবার ওপরে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল,এ যাত্রা বোধহয় আর শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো হল না। সামনের দিকে অনেক দূরে দুটো বিন্দুর মতন ক্যাপ্টেন আর আনন্দকে দেখতে পেলাম একরকম হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে, তবে প্রায় স্যাডল পর্যন্ত পৌঁছেই গেছে ওরা। এদিকে বিনোদ উৎসাহ দেওয়ার বদলে বলতে থাকল, "এভাবে চললে সারা দিনেও পৌঁছানো যাবে না"! একটু জিরিয়ে একটা লম্বা দম নিয়ে শেষবারের মতন আরেকটা চেষ্টা করলাম। এবার গড়ানো পাথর বেয়ে একটু ওপরে উঠেই টিকটিকির মতন শুয়ে পড়ে হাত-পা-শরীর দিয়ে নিচের দিকে পড়ে যাওয়া আটকানোর চেষ্টা করলাম। এতে কাজ হল,বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় গড়ানো খাড়া পথটা পার করতে পারলাম। পরের পথেটুকুতে পাথর থাকলেও চড়াই ততটা বেশি নয় তাই পায়ে হেঁটেই এগোনো সম্ভব হল। খুব আস্তে শরীরের ওপর ব্যালেন্স রেখে স্যাডলের চূড়ার কাছে পৌঁছাতেই আনন্দ আর ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেলাম। শেষ পথটুকু মনের আনন্দে প্রায় ছুটে চলতে গিয়ে এক গোল বাঁধল। গড়ানো পাথরের চড়াই বেয়ে ওঠার সময় সঙ্গে আনা ট্রেকিং পোলটা পিঠের ব্যাগের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ মাথায় পৌঁছানোর একটু আগেই তা পিঠ থেকে ছিটকে গড়ানো পাথরের সঙ্গে নিচে পড়ে গেল। তখন সেদিকে তাকানোর ইচ্ছেও করল না, আমায় পৌঁছাতে দেখে ক্যাপ্টেন দুহাত বাড়িয়ে দিল, আমিও ছুটে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জড়িয়ে ধরলাম। "পেরেছি ক্যাপ্টেন পেরেছি" বলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেনের মুখেও তখন ফুটে উঠেছে অসম্ভবকে সম্ভব করার এক পরম তৃপ্তি।

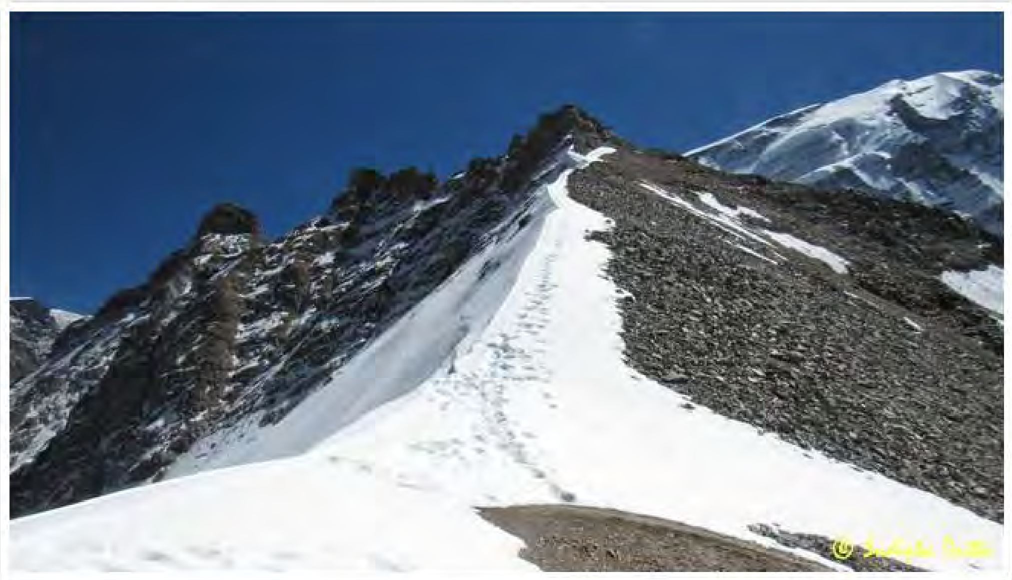

এর আগে দু-দুবার এপথে এসেও ভাগ্য সহায় না হওয়ায় সুখেনদার এই রন্টি স্যাডল পর্যন্ত পৌঁছানো হয়নি। একবার ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর তুষারপাতের জন্য ওঁকে ভাগুয়াবাসা থেকেই ফিরে যেতে হয়েছিল। অন্যবার দলের একজন অভিযাত্রী অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর জুনারগলি পর্যন্ত পৌঁছেও আর এগোনো সম্ভব হয়নি। তাই স্যাডলে পা দেওয়ার পর আবেগে ভেসে যাওয়া ক্যাপ্টেনের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নয়, তবু নিজের স্বভাবমত সেই আবেগ মনের মধ্যে ধরে রেখেই চারপাশের অজানা পৃথিবীকে দুচোখ ভরে দেখতে লাগল। সেই কবে পয়লা অক্টোবর রওনা দিয়েছিলাম লোহাজং থেকে আর তারপর দিনক্ষণ ভুলে টানা সাতদিন হেঁটে এই গড়ানে পাথরের পাহাড়ে চড়তে পেরেছি তা কি কম পাওনা?

যেখানে পৌঁছেছি তা অনেকটা ঘোড়ার পিঠের মতো, বা বলা ভালো ঘোড়ার পিঠে লাগানো আধখানা চাঁদের আকারের জিনের মতো। এমাথা-ওমাথা একটা মসৃণ লম্বা শিরা রয়েছে যার এপাশ-ওপাশ দুদিকেই পাহাড়ের ঢাল। জিনের দুমাথায় যেমন সওয়ারির বসার সুবিধার জন্য দুটো উঁচু অংশ থাকে সেরকম লম্বা শিরার দুমাথায় দুটো কালো এবড়োখেবড়ো পাথরের টিলা রয়েছে। ব্রিটিশ অভিযাত্রী ডঃ লংস্টাফের ইচ্ছে অনুযায়ী "রন্টি নালা"র খুব কাছে ঘোড়ার জিনের আকৃতির এই পাহাড়-শিরা বা রিজটির নাম রাখা হয়েছে "রন্টি স্যাডল"। এখানেও "সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা" নির্দেশ করে এরকম কোনো সাইনবোর্ড নেই, থাকার কথাও নয়, তবে ইন্টারনেট মতে এর উচ্চতা ৫৩০০ মিটারের কাছাকাছি, অর্থাৎ হোমকুণ্ড থেকে এই কয়েক ঘন্টায় প্রায় বারো-তেরোশো মিটার ওপরে উঠে এসেছি।

"রন্টি স্যাডলের" লম্বা শিরার ওপর পড়ে থাকা তুলোর মতো তুষারের বেশ কিছু অংশ সূর্যের তাপে গলে গেছে, তবে সেই তুষারের নিচের জমাট বরফের হেরফের হয়নি। স্যাডলের একপাশের ঢাল বেয়ে উঠে এসেছি, আর অন্য পাশ? তা জানার জন্যেই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম জমে থাকা পিছল বরফের দিকে। স্যাডলের একেবারে মাথায় পৌঁছতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো জনমানুষহীন, প্রাণহীন, মানবসভ্যতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সম্পূর্ণ অজানা এক জগত।

স্যাডলের ওপাশে রয়েছে বাদামী-সোনালী পাহাড়ে চারদিক ঘেরা বরফে ঢাকা এক উপত্যকা। দেখতে অনেকটা কড়াইয়ের মতো,চারধারে মসৃণ পাহাড়ের আর তার একেবারে তলার অংশে জমে রয়েছে সাদা বরফের স্তর। স্যাডল থেকে যে ঢালটা সেই উপত্যকার দিকে নেমে গেছে তার পুরোটাই সাদা বরফে ঢাকা, একবার পা হড়কালে একেবারে নিচ পর্যন্ত পিছলে যেতে হবে, আর এ পথে উঠে আসার কোনও উপায় থাকবে না। স্যাডল পেরিয়ে ওপাশে যে কোনো ট্রেকিং হয় না তা নয়,তবে সেই পথ খুবই দুর্গম। গোলাকার উপত্যকার ধার দিয়ে একটা হালকা পথের আভাস চোখে পড়ল যা উপত্যকার শেষ মাথায় গিয়ে পাথরের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে, হয়তো সেই পথও গিয়ে মিশেছে অন্য কোনও এক অজানা জগতে!

স্যাডলের ওপরে সবসময়ই ঠান্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে, ব্যাগে মানবদার মাফলারটা থাকা সত্ত্বেও সেটা কাজে লাগানো হয়নি। এবার সেই মাফলারকেই পতাকার মতো মেলে ধরে আমরা অভিযানের সাফল্য সেলিব্রেট করলাম। মানবদা আর বাবুদা এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে না জানি কত আনন্দই করতে পারতাম, ওদের ভীষণভাবে মিস্ করলাম ক্যাপ্টেন আর আমি। অজানা উপত্যকা থেকে চোখ ফিরিয়ে আশেপাশের পাহাড়গুলোকে দেখতে থাকলাম। উপত্যকার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁদিকে রয়েছে রন্টি পর্বত আর ডাইনে বেথারতোলি। এছাড়াও আরও অনেক অচেনা পাহাড়ের চূড়াও উঁকি মারছিল তাদের পাশ থেকে। স্যাডলের বাঁদিকে নন্দাঘুন্টিকে আরো কাছ থেকে দেখা গেল। যে পথে এসেছি সেদিকে ফিরতে ত্রিশূল পাহাড়ের চূড়াগুলোর পেছন দিকটা নজরে এল। আর দূরে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল জুনারগলি, যে গিরিপথ মাত্র একদিন আগেই পার হয়ে এসেছি।
সেই সক্কালে দোদাং থেকে রওনা দিয়েছিলাম, বেলা প্রায় বারোটা বাজে, খিদে তেষ্টা পাবে না তা কী হয়? সামান্য কিছু টিফিন দোদাং থেকেই প্যাক করে নিয়ে এসেছিলাম,স্যাডলের ওপর পা ছড়িয়ে বসে তাই দিয়েই দুপুরের খাওয়া সারা হল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাভালাঞ্চ নামার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে, তাই আর কিছুক্ষণ সময় কাটানোর ইচ্ছে থাকলেও

হয়ে নামতে গেলেই গড়িয়ে পড়তে হয়। আনন্দ শিখিয়ে দিল কিভাবে সাইড হয়ে ওপরে এক পায়ের সাপোর্ট নিয়ে আরেক পায়ে ভর দিয়ে নামতে হবে। তাতেও যে খুব মসৃণভাবে নামা গেল তা নয়, তবে বেশ কিছুটা সুবিধা হল বৈকি। তার মধ্যেও একবার পিছল বরফে পড়ে বিপজ্জনকভাবে নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিলাম, বিপদ বুঝে আনন্দ দৌড়ে এসে না বাঁচালে সে যাত্রায় বেশ দুঃখ ছিল কপালে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোরেন পার হয়ে বড় বোল্ডারের স্তরে এসে পৌঁছালাম, অর্থাৎ এরপর আর ভয়ের কিছু নেই। তবে এতক্ষণের ধকলে পা আর চলতে চাইছিল না, খুব ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকলাম। হোমকুণ্ড থেকে স্যাডল পর্যন্ত যে পথ চার ঘন্টায় উঠেছিলাম মাত্র সোয়া দুঘন্টায় সেই পথে নিচে নেমে এলাম।

এবেলায় হোমকুণ্ড আর শুধুই বরফেঢাকা সমতল জমি নয়, বরফগলা জল জমা হয়ে তা রীতিমতো লেক হয়ে উঠেছে। যে নালা পেরিয়ে মন্দিরের কাছে পৌঁছেছিলাম তা এখন আর শান্ত নেই, সরু পাহাড়ি নদীর আকার নিয়েছে। রন্টি স্যাডলের মোরেন বিছানো পথ আর তার দুপাশের দেওয়ালের ওপর যে সাদা বরফ জমে ছিল তাও এতক্ষণে গলতে শুরু করেছে। সেই জল নালা বেয়ে জোরালো স্রোতে নেমে এসে হোমকুণ্ডে মিশছে। ভাবতে খুবই অবাক লাগছিল যে নুড়িমেশানো বরফের ওপর দিয়ে একটু আগেই আমরা হামাগুড়ি দিয়েছি, শরীরটাকে কোনো রকমে টেনে হিঁচড়ে ওপরে তুলেছি আর তারপর হেঁটেও বেড়িয়েছি তার থেকেই কি না তৈরি হয়েছে আস্ত একটা নদী - নন্দাকিনী!

চারদিক পাহাড়ে ঘেরা থাকায় দুপুর পেরোনোর আগেই সূর্যের আলো কমে আসতে লাগল। ক্যাপ্টেন আগেই ফেরার পথ ধরেছে, হোমকুণ্ডের মন্দিরগুলোর সামনে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমিও দোদাং-এর পথে পা বাড়ালাম। "ডাইনোসরের পিঠ"এর পথ দিয়ে যখন দোদাং এসে পৌঁছালাম তখন বিকেল সাড়ে তিনটে। দেখা হল এক বাঙালি পর্বত অভিযাত্রীদলের সাথে, ওরাও দোদাংয়ে ক্যাম্প করেছে। এখান থেকে রওনা দেবে ত্রিশূল পাহাড়ের দিকে। হোমকুণ্ড থেকে ফিরে এসে মানবদা আর বাবুদা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সারাদিনের ক্লান্তি ভুলে অজানা-অচেনা পৃথিবীর যে ছবি একটু আগেই দেখে এসেছি সে অভিজ্ঞতা ওদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে লাগলাম। খুব শিগগিরই সামনের রূপোলি পাহাড়ে চকচকে আলোর ঝলকানি দেখিয়ে সূর্য আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। একটু পরেই রাতের খাবার খেয়ে কনকনে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে আশ্রয় নিলাম। দোদাংয়ে আগের রাত কেটেছিল চাপা টেনশনে, কিন্তু এরাতের পুরোটা জুড়েই ছিল রন্টি স্যাডলের স্বপ্নের দেশ।

নদী পেরিয়ে জঙ্গলের পথে

সকালের লালরঙা সূর্য পাহাড়ঘেরা দোদাং ক্যাম্পসাইটের চোখের আড়ালেই থেকে যায়। আগের দিনের মতো এদিন অতটা সকালে না বেরোলেও চলবে,তাই স্লিপিং ব্যাগের ভেতরেই আরেকটু বেশি সময় কাটানো গেল। এদিন চ্যালেঞ্জ একটাই, জোরালো স্রোতে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী নন্দাকিনীকে পায়ে হেঁটে পার হওয়া। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীতে জলের পরিমাণ বাড়তে থাকে, তাই বেশি দেরি হয়ে গেলে আর ওপারে যাওয়া সম্ভব হবে না! হালকা ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল আটটার মধ্যেই দোদাংকে গুডবাই জানাতে হল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই আরেকটি ক্যাম্প দেখতে পেলাম, এখানেও বাঙালি টিম। কাল বিকেলে দোদাং পৌঁছেছে,এখন রন্টি স্যাডল যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এত দেরিতে রওনা দিয়ে কী করে স্যাডল পর্যন্ত পৌঁছাবে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। ক্যাপ্টেন বলল হয়তোবা হোমকুণ্ডে আরেকটি ক্যাম্প করবেন ওঁরা।

পুরনো পথে কাঠের পুল পেরিয়ে বোল্ডার জোন টপকে একটু পরেই নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। সকাল সবে নটা বাজে, এর মধ্যেই নন্দাকিনীতে জলের বেগ যথেষ্ট বেড়ে গেছে। এখন নালার আকারে থাকলেও ক্রমশই তা আরও চওড়া হচ্ছে।

জমে রয়েছে সবুজ শ্যাওলা আর পাথরগুলোও বেশ নড়বড়ে। গাইড হিসেবে আনন্দই প্রথমে এগিয়ে গেল পথ দেখানোর জন্য। জলে পা দেওয়া মাত্রই শ্যাওলায় পা পিছলে চিৎপাত হয়ে পড়ল,তবে চটজলদি উঠে দাঁড়িয়েই বলে উঠল - "অ্যায়সা চলতা হ্যায়, চলতা হ্যায়"! চোট-আঘাত বেশি কিছু লাগেনি,তবে জামা-প্যান্ট ভিজে একসা। তা হোক, কিন্তু এই পথে অন্তত নদীটা পেরোনো যাবে, তাই আমরাও পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। জুতো খুলে কোমরে বাঁধলাম আর ট্র্যাক-প্যান্টের পায়ের কাছটা যতটা পারলাম গুটিয়ে নিলাম। নিজে ভুক্তভোগী হওয়ায় আনন্দ খুব ভালোভাবেই রাস্তা দেখাতে লাগল,কোথায় শ্যাওলায় পা পিছলাবে আর কোন পাথরটা গড়িয়ে যাবে সে ব্যাপারে আগে থাকতেই সতর্ক করে দিতে থাকল। তারপরও প্রয়োজনে হাত ধরে তীব্র জলের স্রোতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল। দু'একবার পা হড়কানো ছাড়া বেশ নিরাপদেই নদীর ওপারে গিয়ে উঠলাম। নদী পেরিয়ে বেশকিছু বোল্ডারের ওপর দিয়ে হেঁটে-লাফিয়ে একটা গড়ানো পাথরের খাড়া রাস্তা বেয়ে পাহাড়ের ওপরের ঘাসেঢাকা জমিতে এসে পৌঁছালাম।
নন্দাকিনী নদী পার হতে সময় লেগেছে প্রায় পৌনে একঘন্টা, তবে এর পরের রাস্তা খুব কঠিন নয়, তাই সবুজ ঘাসের ওপর বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়ার ফুরসত পাওয়া গেল। এখান থেকে শিলা সমুদ্রের সেই পাথরের নদী, মোরেন জোন আর স্নাউট পয়েন্ট সামনাসামনি দেখা যাচ্ছে। কালো রঙের হিমবাহটাও তার ওপরে হাঁ করে রয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে বাদামি-সবুজ ঘাস আর বুনো ফুলে ঢাকা রঙিন পাহাড়, আগের দিন পাহাড়গুলোতে যে রুক্ষতা দেখেছি এখানে তার বিন্দুমাত্র নেই। নির্জন পাহাড়ের খাতে নন্দাকিনী নদী বয়ে চলার জোরালো শব্দে যেন চারপাশে একটা প্রাণের ছোঁয়া অনুভব করতে পারছিলাম।

সামান্য বিশ্রামের পর আবার জলের ধারাকে বাঁ পাশে রেখে পাহাড়ের ওপরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। একটু পরে খচ্চরের পিঠে ব্যাগপত্তরগুলো চাপিয়ে বিনোদ, মনিন্দর আর হিরা সিং পাশ কাটিয়ে হাত নাড়াতে নাড়াতে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল। ঘন্টাখানেক হাঁটার পর একটা কাঠের সেতুর কাছে এসে পড়লাম। এ জায়গাটার নাম চন্দনিয়া ঘাট। দোদাং-এর পুল-এর মতো এখানকার সেতুতেও সবুজ রঙ করা। পুলের নিচে বয়ে চলা নন্দাকিনী এখন নালা থেকে নদীতে পরিণত হয়েছে। ওপর থেকেই তার জোরালো স্রোত সম্পর্কে খুব ভালোই আন্দাজ করা যাচ্ছিল। পুল পেরিয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাপকাটা একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম।

পাহাড়ের গায়ে গজিয়ে ওঠা উঁচু উঁচু বার্চ গাছের জঙ্গল খুব একটা ঘন নয়। নদী পেরোনোর পর নন্দাকিনী এখন আমাদের ডান দিক দিয়ে বইছে। তবে এই জঙ্গলের রাস্তা একেবারে নির্জন নয়, পথে কিছু মালবাহকের দেখা পাওয়া গেল। আর কিছুটা এগোতে একটা পাহাড়ি ঝরনা দেখতে পেলাম। এই ঝরনার জল নেমে আসছে পাহাড়ের অনেক ওপর থেকে আর তার স্রোতের তেজও কিছু কম নয়। কয়েকটা নড়বড়ে পাথরের ওপর পা ফেলে সেই জল পেরোনো গেল। জঙ্গলে ঢোকার পর থেকে মাঝে মাঝেই আনন্দ কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল,আবার কিছুক্ষণ পরে সামনে এসে উদয় হচ্ছিল। তবে এখানে পায়ে চলার পথ বেশ স্পষ্ট হওয়ায় রাস্তা চিনে নিতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না। হঠাৎই দেখি পাহাড়ের খাদের ওপর ঝুলে পড়া একটা লম্বা গাছের ওপর আনন্দ পা ঝুলিয়ে বসে রেডিও শুনছে! আমরা সেখানে পৌঁছাতেই অদ্ভুত দক্ষতায় গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। বার্চ গাছের জঙ্গলের পর এল বাঁশের বন। অগুনতি গাছ পেরিয়ে মাইলের পর মাইল কেমন যেন সম্মোহিতের মত হাঁটতে থাকলাম। প্রায় পৌনে দুটোর সময় এক জায়গায় এসে কিছু লোকজনের দেখা মিলল। বুঝলাম জনবসতি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। একটা সাইনবোর্ডও চোখে পড়ল, তাতে গ্রামের নাম লেখা রয়েছে "জামুনডালি"। এখানে সামান্য কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার জঙ্গলের পথ ধরলাম। আরো একঘন্টা পথ চলার পর একটা পাথরের ছোট মন্দির চোখে পড়ল। মন্দিরে বিগ্রহের বদলে রয়েছে একটি বড় শিলা আর ত্রিশূল। পাশেই একটা সাইনবোর্ড জানিয়ে দিচ্ছে অবশেষে "লাটা কৌপড়ি"তে পৌঁছেই গেছি। সামনে একটা রাই ক্ষেতের পাশে আমাদের সবুজ টেন্টগুলো চোখে পড়ল, বিনোদ, মনিন্দররা অনেক আগেই এখানে পৌঁছে গেছে।

চারদিক জঙ্গলেঘেরা লাটা কৌপড়িতে নজরকাড়া কোনও সৌন্দর্য নেই,তবে টেন্টের সামনে ঘাসেঢাকা বেশ কিছুটা খোলা জমি রয়েছে,তার ওপরে মেঘের আড়াল থেকে একটা বরফসাদা পাহাড়ের চূড়া উঁকি মেরে আগের কদিনে কাটিয়ে আসা পাহাড়ি ক্যাম্পগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সাইনবোর্ডের লেখা অনুযায়ী এখানকার উচ্চতা ৩০৯৫ মিটার, তবে এতটা

ওপারে ঘন জঙ্গল। বিকেলে সেখানে ভেড়ার পাল চড়ে বেড়াতে দেখলাম। জঙ্গল হলেও এখানে খচ্চরগুলোর খাওয়ার জন্য ঘাস পাওয়া যায় না। বিনোদ দেশোয়ালি গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নিচের কোথা থেকে পিঠে করে সেই ঘাস বয়ে নিয়ে এল। জঙ্গলের মধ্যে দিনের চেয়ে রাত অনেক বড়, তাই সন্ধ্যা নামতে বেশি দেরী হল না। আমাদের টেন্ট থেকে রান্নার তাঁবু কিছুটা দূরে, একটু পরে পরেই সেখান থেকে স্যুপ, চা-বিস্কুট, ন্যুডলস আসতেই থাকল। সন্ধ্যার পর ক্যাম্পফায়ার করা হবে বলে আশপাশ থেকে শুকনো ডালপালা জোগাড় করা হল।

সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে হিমবাহের বরফ গলার আগেই মোরেন জোন পেরিয়ে যাওয়ায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। এর পরের পথ বিশেষ চ্যালেঞ্জিং নয়। কখনও পাহাড়ের গায়ে খয়েরি-সবুজ ঘাসের মাঝে মাটির পথ আবার কখনও নদীর ধারের পাথুরে পায়ে চলা পথ ধরে ধীরেসুস্থেই চলতে থাকলাম। পথে চড়াই কম, মোটামুটি সোজা রাস্তাই বলা যায়। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় ঘেউথাপ্পানের কাছাকাছি পৌঁছে বিশ্রামের সময় হল। আনন্দ জানাল ব্যাগপত্তর আর রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে বিনোদরা এখনও এসে পৌঁছায়নি, তাই বেশ কিছুটা সময় রয়েছে এই সুন্দর জায়গাটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার জন্য। রোদের তাপ আস্তে আস্তে বাড়ছে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে। সামনে প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে নন্দাকিনী নদী, কিন্তু তার জল বালি-পাথরে ভরা। ক্যাপ্টেন শিখিয়ে দিল যে নদীর ধারের দিকে শ্যাওলাপড়া জমির ওপর দিয়ে যে জল বয়ে যায় সেই জল অনায়াসে খাওয়ার জন্য নেওয়া যেতে পারে। সেইমতোই আমরা বোতলে ঠাণ্ডা জল ভরে নিলাম আর প্রাকৃতিক কোল্ডড্রিঙ্কস-এ গলা ভেজালাম। ব্যাগ থেকে আস্তে আস্তে বিস্কুটের প্যাকেট আর শুকনো খাবার বেরিয়ে এল, তাই দিয়েই দুপুরের টিফিন সারা হল। আনন্দ সেই লোহাজং থেকে একখানা রামধনুর মতো সাতরঙা ছাতা নিয়ে পথ চলছিল, এখানে এসে সেটা মেলে রোদের আড়াল খোঁজার চেষ্টা করল। নদীর ধারের এই জায়গা থেকে আঁকাবাঁকা নন্দাকিনীকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। পরের পথের প্রায় পুরোটাই পাথুরে আর সাদা ছাইয়ের মতো রঙের।

কিছুক্ষণ পর রাঁধুনি আর পোর্টাররা এসে পড়লে আবার এগোতে শুরু করলাম। এপথে কোথাও কোথাও পথের ধারে লাল রঙের বাহারি পাতার গাছ, কোথাও ছোট ছোট বুনো ফল দেখতে পেলাম। কোথাও কোথাও দু-এক গোছা জংলি ঘাসও রয়েছে, কিন্তু তা খচ্চরের খাবার জোগানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তাই বিনোদ আর মনিন্দর অনেক দূর থেকে জোগাড় করা ঘাস পিঠে-মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলেছে পরের ক্যাম্পের দিকে।

নন্দাদেবী ন্যাশনাল পার্কের এই বনে সতর্কতা মেনে আগুন জ্বালানো হয়ে থাকে। দূরের পাহাড়ি বনের মধ্যেও মেষপালকদের জ্বালানো আগুনের লাল আভা দেখতে পাওয়া গেল। আনন্দের কথানুযায়ী এই বনে বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তু-জানোয়ার রয়েছে, তাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে আগুন জ্বালানো খুবই জরুরি। ক্যাম্পফায়ারের আগুন যাতে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায় তাই আশপাশ ভালোভাবে পরিষ্কার করে সেখানে শুকনো ডালপালাগুলো জড়ো করা হল। দিনের আলো নিভে যেতে আগুন জ্বলে উঠল। সেই আঁচে সেঁকে নিলাম নিজেদের। জমাট ঠান্ডার ভাবটা কাটতেই গলা দিয়ে গুনগুন সুর বেরোতে লাগল,আর কিছু পরেই সেই গুনগুনানি গানের আকার নিল। বাবুদা শিল্পী মানুষ,গানের গলাটাও চমৎকার,একার চেষ্টাতেই আমাদের বেসুরো গলায় সুর-তাল-লয় বসিয়ে দিচ্ছিল। একটু পরে বিনোদ-মনিন্দর-আনন্দরাও এসে যোগ দিল। সব মিলিয়ে হয়তো গানের আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না তবে বাঁচোয়া এই যে তার নিন্দেমন্দ করার মতো আশেপাশে আর কেউ ছিলনা।

ক্যাম্পফায়ারের মাঝেই ক্যাপ্টেন একবার টয়লেট সারতে টেন্টের পেছনে জলার দিকে গিয়েছিল,একটু পড়ে দেখি প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। বলল, জলার কাছাকাছি অন্ধকারের মধ্যে সে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ দেখতে পেয়েছে! সেদিকে একনাগাড়ে টর্চের আলো ফেলে রাখায় অবশেষে তা জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। তবে রাতের অন্ধকারে যে জন্তু ঘোরাঘুরি করে তা কতটা নিরীহ সে নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। বারকয়েক শুকনো ডালপালা দেওয়ার পরেও একসময়

দিয়ে একরকম অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে ঘুরতে লাগল। কাছাকাছি কোনও বুনো জন্তু থাকলে নাকি এরকম আওয়াজে সেগুলো দূরে সরে যাবে। রাতে টেন্ট থেকে বেরোতে হলে কী অভিজ্ঞতা হতে পারে সেই দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়েই ঘুমিয়ে পড়তে হল।

রং-তুলিতে আঁকা সুতোল

সকালে ঘুম ভাঙলেও গাইড-পোর্টারদের গলা না শোনা পর্যন্ত টেন্টের বাইরে পা রাখলাম না। শেষমেশ সূর্যের আলোর রেখা দেখা যেতে আড়মোড়া ভেঙে টেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। চা আর জলখাবার খেয়ে সাড়ে আটটার মধ্যে লাটা কৌপড়ি ছেড়ে সামনের শুকনো নালা থেকে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে যাওয়া পথে রওনা দিলাম। এখানে আরো একটি বাঙালি দলের ক্যাম্প চোখে পড়ল,এরাও একই পথে রওনা দেওয়ার তোড়জোড় করছে। নামার পথে কতগুলো শ্যাওলাপড়া সিঁড়ি রয়েছে আর তার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড় থেকে চুঁইয়ে পড়া জলের ধারা। পুরো সিঁড়িটাই বেশ পেছল,সাবধানে পা না ফেললে যে কোনও সময় চিৎপটাং হতে হবে। পায়ে চলা একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে গিয়ে কাদামাখা জঙ্গলের পথ ধরলাম। এই স্যাঁতস্যাঁতে পথে সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া সাধ্যের বাইরে। অগুনতি পাথরের সিঁড়ি আর কাদামাখা রাস্তা পেরোতে পেরোতে এই ট্রেকিংয়ে প্রথমবারের মত বিরক্তি এবং একঘেয়ে লাগতে শুরু করল। প্রায় সাড়ে তিনঘন্টা এভাবে চলার পর দূরে পাহাড়ের ওপর একটা গ্রামের দেখা পেলাম,কিন্তু ওই পর্যন্তই। আরো ঘন্টাখানেক পথ চলতে হল লোকালয় খুঁজে পেতে। বেলা প্রায় একটার সময় তাতড়া বলে একটা গ্রামে এসে উঠলাম। আর পাঁচটা পাহাড়ি গ্রামের সঙ্গে এর বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে চাষ করা হয়েছে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে এখানে রাস্তার পাশে একটি ছাউনি করা রয়েছে আর তার পাশে রয়েছে সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি। লোকালয়ের দেখা পেয়ে কিছুটা হলেও একঘেয়ে ভাবটা দূর হল। এতক্ষণ পর খেয়াল করলাম সবাইকে পেছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে এসেছি। গতি কমিয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম,সামনে রাস্তা ডানে-বাঁয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে, কিন্তু কোন রাস্তায় সুতোল যাওয়া যাবে তা বুঝে উঠতে পারলাম না। কারো দেখা পেলাম না যে সঠিক পথটা দেখিয়ে দেবে। কোনও উপায় না দেখে সেখানে বসেই সময় কাটাতে লাগলাম। প্রায় পৌনে একঘন্টা এভাবে কাটার পর একদল পোর্টারের দেখা মিলল, তাদের কাছে জানতে পারলাম মানবদারাও খুব কাছেই এসে পড়েছে। ওরাই আমাকে সুতোল যাওয়ার জন্য বাঁদিকের রাস্তা দেখিয়ে দিল। সেই পথ ধরে আরও আধঘন্টা এগোতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল রংবাহারি ছবির মতো একটা গ্রাম।

একটু এগিয়ে যে পাথরের সিঁড়ি উঠেছে তার ওপর থেকে গ্রামের একটা দিক চোখে পড়ে। সেখানে সবুজ পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে চাষ করা মোরগ ফুলের মতো দেখতে লাল-হলুদ রামদানার গাছ থরে থরে সাজানো। পাহাড়ের ঢালে বসানো রয়েছে টিনের চালওয়ালা কয়েকটি পাথরের বাড়ি। মাটির রাস্তা গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা পায়ে চলার লোহার ব্রিজে মিশেছে। ছোট-বড় সব শিল্পীই যে এই গ্রামের ছবি তাঁর রংতুলিতে ফুটিয়ে তুলতে চাইবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতোল গ্রামটা বেশ বড়, গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায় রয়েছে অনেকটা অঞ্চল, এমনকি হোমকুণ্ডও সুতোল এই পঞ্চায়েতের মধ্যেই পড়ে। গ্রামের রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে আরো প্রায় পৌনে একঘন্টা হেঁটে একটা পাহাড়ের ঢাল থেকে নিচের দিকে নন্দাকিনী নদী চোখে পড়ল আর সেই নদীর ওপারে সবুজ টেন্টগুলো দেখতে পেলাম। একটা ব্রিজ পেরিয়ে বিকেল তিনটের সময় ক্যাম্পে পা রাখতেই বিনোদ এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল,এখানেই আমাদের নয়দিনের ট্রেকে ইতি পড়ল।

সুতোল একটা প্রাণোচ্ছল গ্রাম, নির্জন পাহাড়ে এতগুলো দিন কাটানোর পর এখানে বিকেলবেলায় ছোট ছোট বাচ্চাদের হইচইয়ে মুহূর্তেই যেন চেনা পৃথিবীতে ফিরে এলাম। ক্যাম্পের সামনের নদীর মাঝে একটা ছোট শিবমন্দির আর ব্রিজের ওপারে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি। নদীর তীরে রামদানার খেতে বাঁধা রয়েছে কয়েকটি পোষ মানানো ঘোড়া। ক্যাম্পের পেছনদিকে একটা গাছপালায় ঢাকা সবুজ পাহাড়, সেখানে ঘোড়া আর খচ্চরের দল নিশ্চিন্তে চড়ে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে খুব সরু একটা পায়ে চলা পথ ওপরে উঠে গেছে। সন্ধ্যা নেমে আসতেই রাখালছেলেরা একে একে সে পথ দিয়ে নেমে এসে গ্রামের দিকে এগোতে লাগল। বাড়ি থেকে লজেন্স নিয়ে এসেছিলাম, এতদিন সেগুলো দেওয়ার মতো কাউকেই খুঁজে পাইনি, এখানে বাচ্চাদের হাতে বিলিয়ে দিতে থাকলাম। একটা ছোট্ট মেয়ে গাছের ডাল নিয়ে পোষা গরুটাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে, পেছন পেছন তার ঠাকুমা পাহাড় থেকে তুলে আনা সবজি মাথায় করে নেমে আসছে। আমরা তাদের হাতে কয়েকটা লজেন্স দিতে বয়স্ক ঠাকুমা তার ঝুড়ি থেকে বড় বড় খিরা আমাদের হাতে তুলে দিল। গ্রামের মানুষের এই সরলতা কি আর ব্যস্ত শহরে খুঁজে পাওয়া যায়?

রাতে হিরা সিং হরেক রকম খাবারের আয়োজন করেছে, ভাত-ডাল-রুটির সঙ্গে ডিমের কারি, আলুর তরকারি ছাড়াও হালুয়াজাতীয় এক ধরণের মিষ্টি বানিয়েছে। আনন্দ, বিনোদ, মনিন্দরদের মনে একটা খুশির ছোঁয়া, এত দিন পরে যে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। রাতে কিচেন-টেন্টে তাসের আড্ডা বসল, রেডিওতে চলল গাড়োয়ালি গান। বাড়ি ফেরার প্ল্যান ঠিক করতে করতে রাত গড়িয়ে গেল, ট্রেকের টুকরো ছবি মনে ভাসতে ভাসতে দুচোখ জড়িয়ে এল ঘুমে।

বিদায় বেলায়

জানানোর সময় নিজেদের আবেগকে বশে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কচিকাঁচাদের পাহাড়ি পথে ব্যাগ পিঠে স্কুল যাওয়া দেখতে দেখতে বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল, আজ ছয়দিন পর আবার যোগাযোগ করা সম্ভব হবে বাবা-মা-বোনের সঙ্গে। অন্যান্যবারের মত এবারেও দুর্গাপুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলাম, সে আনন্দের অংশীদার হয়ে রইল পাহাড়-নদী আর বরফের এক স্বপ্নরাজ্য রন্টি স্যাডল।

[লেখাটির বেশকিছু তথ্য Bill Aitken-এর লেখা "Touching upon the Himalaya: Excursions and Enquiries" বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও "The Alpine Journal 1979, Vol 84 No 328" পত্রিকায় প্রকাশিত P.J. Horniblow-এর লেখা "In the steps of Shipton" এবং "Himalayan Journal, Vol 09, 1937" পত্রিকায় প্রকাশিত Eric Shipton-এর লেখা "Survey Work in the Nanda Devi Region" প্রবন্ধ দুটি থেকেও অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।]

~ সমাপ্ত ~

~ রন্টি স্যাডল ট্রেক রুটম্যাপ || রন্টি স্যাডল ট্রেকের আরও ছবি ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকার সহসম্পাদক সুদীপ্ত দত্ত ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নিরালার খোঁজে। নতুন জায়গার সাথে মিশে আপন করে নেন সেখানকার জীবন, সংস্কৃতি আর খাদ্যাভ্যাস। তারপর তাঁর প্রিয় পত্রিকাটির পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন সেই যাত্রাপথের খুঁটিনাটি।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

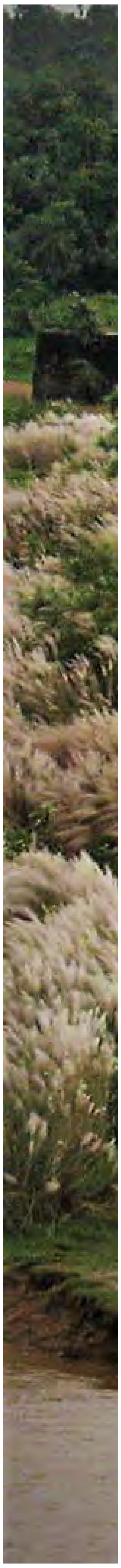

অরণ্যের দিনরাত্রি

তাপস মণ্ডল

সময়টা সেপ্টেম্বর, ২০০৮...
দু-তিন দিন ধরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে, নিম্নচাপ আর কী... তিন-চার দিন হল দেখা হয়নি জুম্বাদা, বাপ্পা, প্রসেন, সুদীপ্তদা, চিকুর সঙ্গে...ভালো লাগছে না। অফিস থেকেও দেরি করে বেরোচ্ছি। ১৬ তারিখ রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাপ্পার ফোন এল...
- কী রে কোথায়? কী করছিস?
- এইতো বাড়িতে... তেমন কিছু না...
- কাল সকাল সাড়ে ছটায় বাউরিয়া স্টেশনে চলে আয়। আর কাউকে ফোন করিস না।
কী যেন একটু ভেবে বললাম, – কেন? কোথাও বেরোচ্ছি?
ওদিক থেকে বাপ্পা বলল, – হুমম, বাঁকুড়া। কিন্তু তুই যাচ্ছিস ব্যাপারটা সিক্রেট। আর কেউ জানবে না। ঠিক আছে রাখছি, কাল সাড়ে ছটায় দেখা হচ্ছে।
বাপ্পার কথাটা শুনে মনের ভিতরটা ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠল...সবকিছু ছেড়ে আবার বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। রাত্রে বাড়িতে বললাম, 'মেক মাই ট্রিপ' থেকে দুদিন-এক রাত্রির ফ্রি ট্রিপ আছে। আর প্ল্যান করলাম, কাল অফিসে বলব হলদিয়ায় দাদুর খুব শরীর খারাপ তাই যেতে হচ্ছে। সারারাত চাপা উত্তেজনায় ঘুম হল না।
পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোলাম। আকাশ প্রায় অন্ধকার। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। জনশূন্য অটোস্ট্যান্ড... একটাও অটো নেই। প্রায় আধঘন্টা অপেক্ষার পর মনটা অস্থির হয়ে উঠল। ভাবলাম এই দুর্যোগে যদি কিছু না পাই তা হলে হেঁটেই ষ্টেশন চলে যাব। খুব বেশি হলে হয়তো আধঘন্টা সময় লাগবে। তারপর মাথায় একটা প্ল্যান এল, হাত দেখিয়ে রাস্তায় এক লরি দাঁড় করালাম। সহৃদয় ড্রাইভারদাদা হাসিমুখে স্টেশন অবধি লিফট দিয়ে দিলেন। স্টেশনে পৌঁছালাম ছটা কুড়িতে। বাকিরা আমাকে দেখে অবাক। ট্রিপের শুরুতেই এই চমকটা ওরা কেউ আশা করেনি। সুদীপ্তদা চিৎকার করে উঠল 'ট্রিপটা তো জমে গেল'।

বাউড়িয়া থেকে ডাউন লোকালে সাঁতরাগাছি, তারপর সাঁতরাগাছি থেকে শালিমার-আদ্রা 'আরণ্যক এক্সপ্রেস'। গন্তব্য বাঁকুড়া জেলার কোনও এক 'আসনার জঙ্গল'। এরচেয়ে বেশি তথ্য আমাদের কারও কাছেই নেই। নেওয়ার ইচ্ছাও কারোর ছিল না। এই ভেবেই ভালো লাগছিল কোথায় যাচ্ছি, কিভাবে যাব, সেখানে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে কিছুই জানি না। শুধু চলার তাগিদেই পথে নামা। ছুটে চলা এক সবুজ আনন্দের উদ্দেশ্যে কোনও এক দিকশূন্যপুরে...
সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেন ছাড়ল সাড়ে সাতটায়। ফাঁকা ট্রেন। ঘোর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কিছু রেল কর্মচারী আর আমরা কয়জন বাদে কেউ আর ঘর ছেড়ে বেরোতে সাহস করেনি। কাঠের চওড়া পাটাতন দেওয়া সিটে হাত পা ছড়িয়ে বেশ আয়েশ করে মুখোমুখি বসে পড়লাম। এক আকাশ মেঘের নিচে পাতা সমান্তরাল সর্পিল রেলপথ বেয়ে ছুটে চলেছে আমাদের ট্রেন পিছনে ফেলে রেখে গাছপালা, ঘরবাড়ি। পার হয়ে যাচ্ছি ছোট বড় ষ্টেশন, আটপৌরে মফঃস্বল। দেখতে দেখতে ঘরবাড়ি, জনপদের জায়গা অদলবদল করে নিল সবুজ ধানখেত। তার শেষপ্রান্তে গিয়ে মিশেছে স্লেট রঙা আকাশটা। ট্রেন থামল, মেচেদা ষ্টেশন। ট্রেনজার্নি আর আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাওয়া হল নারকোল দেওয়া মশলামুড়ি আর মাটির ভাঁড়ের চা। জুম্বাদা কোথা থেকে কিনে আনল 'নিউজ পেপার'। সেইসময় এখনকার মত হাই ডেফিনেশন ক্যামেরা ফোন সহজলভ্য ছিল না, বা থাকলেও তা ছিল আমাদের সাধ্যাতীত। সম্বল বলতে বাপ্পার নোকিয়া ৬২৩৩। আর একটি ছোট হটশট ক্যামেরা। তাই দিয়েই ফ্রেমবন্দী করতে লেগে পড়লাম বিভিন্ন মুহূর্তদের।

শীর্ণকায়া কংসাবতী বর্ষার জলে উন্মত্ত যৌবনা। তার দুই পাড় জুড়ে সাদা কাশের জঙ্গল বোধহয় শরতের নীল আকাশ আর পেঁজা তুলোর মত মেঘের প্রতীক্ষায় সাজিয়ে তুলছে নিজেকে। ট্রেনের জানলা দিয়ে শেষ বর্ষার অপরূপ রাঢ়বঙ্গ চোখে মাখতে মাখতে নিখাদ আড্ডায় বিলীন হয়ে গেলাম আমরা ছয়জন। শালবনিতে ট্রেন দাঁড়াতে একটু নেমে হাতপাগুলো ছাড়িয়ে নিলাম। সবুজে মোড়া স্টেশনকে সাক্ষী রেখে কয়েকটা ছবিও ফ্রেমবন্দী করলাম। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলাম গড়বেতা, পিয়ারডোবা। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন। ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে তুলে নিলাম বেশ কিছু ছবি। তার মধ্যে বাপ্পা হঠাৎ রেগে ভীষণ গালাগাল করল। ব্যাপার সাংঘাতিক, অনেকক্ষণ পোজ দেওয়ার পর তোলা ছবিতে দৃশ্যমান শুধু ওর নাক! ক্যানডিড ফটোগ্রাফি নিঃসন্দেহে !

এরকম আনপ্ল্যানড ট্যুর আগে কখনো হয়নি। আর জঙ্গলে রাত্রিবাসও প্রথম। তাই একটা চাপা উত্তেজনা সবার মধ্যেই ছিল। বিষ্ণুপুর স্টেশনে নামলাম তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। স্টেশনে বড় ডিসপ্লেবোর্ড জুড়ে বাঁকুড়ার ম্যাপ।

সুদীপ্তদা বলল, "ভাই ম্যাপে তো তোর 'আসনা' নামে কোন জায়গা নেই"।

জুম্বাদা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় বাবা তোমার 'আসনা' ?"

ঘাবড়ে না গিয়ে চিকুর কনফিডেন্ট উত্তর, "ও আছেই আশেপাশে কোথাও। একটু খুঁজে দেখতে হবে। ঠিক আছে, কোন চাপ নেই... একটা ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলব।"

এখানে বলে রাখি চিকুর ওই তথ্য আশির দশকের কোন এক ভ্রমণ সংক্রান্ত ম্যাগাজিন থেকে প্রাপ্ত। তার আগে পরের কোন কিছুই জানার চেষ্টা আমরা করিনি। ওই যে বললাম গন্তব্যটা মূল উদ্দেশ্য ছিল না। সে যাই হোক, চিকু বেশ কেতা মেরে পাশের সিগারেটের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে বেশ কায়দা করে জিজ্ঞেস করল, "দাদা এখানে 'আসনা' জায়গাটা কোন দিকে?"

চিকুর কনফিডেন্সে সজোরে ধাক্কা দিয়ে দোকানদার দাদা উত্তর দিলেন, "ওই নামে তো এখানে কিছু নেই।"

উত্তর শুনে আমাদের সম্মিলিত হাসির আওয়াজে আশপাশের গাছ থেকে কাক উড়ে গেল। তারপর চিকুকে বন্ধুবৃত্তে প্রযোজ্য উপযুক্ত সম্ভাষণে ভূষিত করে আমাদের কর্তব্য পালন করলাম। ওর ভরসায় আর না থেকে ঠিক হল জঙ্গল যখন যাব ঠিক করেছি তখন কাছের রেঞ্জ অফিসে একবার ঢুঁ মেরে দেখা যাক। বৃষ্টিভেজা লাল মাটির রাস্তায় হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটা লাগালাম রেঞ্জ অফিসের দিকে। জুম্বাদা বরাবর সাহেবি কেতার মানুষ, ওসব দিশি প্যান্ট গোটানো ধাতে নেই। তাই লাল কাদামাটি সাদা প্যান্টে যে অপরূপ শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তুলেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

লাল রঙা, পুরনো ব্রিটিশ আমলের বিল্ডিং। গেট পেরিয়ে রেঞ্জঅফিসে ঢুকে দেখলাম সার দিয়ে দাঁড়ানো তিনটে জিপ। বিশ্বকর্মা পুজো -তারই তোড়জোড় চলছে। বাইরের বেঞ্চে বসলাম। জুম্বাদা ভিতরে গেল রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। সব শুনে তিনি জানালেন আসনা রেঞ্জ এখান থেকে অনেকদূর। তারপর অ্যাডভান্স বুকিং-এর ব্যাপার আছে। তার থেকে আমরা যদি চাই উনি জয়পুর রেঞ্জে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। শুনে সবচেয়ে স্বস্তি পেল চিকু। বেচারা আমাদের জ্বালায় বেশ কিছুক্ষণ থেকে মুখটা প্যাঁচার মত করে ছিল। যদিও খুব সত্যি কথা যে কম বেশি চিন্তিত আমরা সবাই ছিলাম। রেঞ্জার সাহেবের কথা মত জুম্বাদা একটা ফুলস্কেপ সাদা কাগজ জোগাড় করে প্রাঞ্জল ইংরেজিতে খসখস করে লিখে ফেলল পাতাভর্তি অ্যাপ্লিকেশন। আবেগের বশে কিঞ্চিৎ বেশিই লিখেছিল বোধহয়। কারণ নিচে আমাদের সই করার জায়গা প্রায় ছিল না। বাপ্পা চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল, "করেছ কী!"

ঝোলানো চশমার ফাঁকে জুম্বাদার গম্ভীর উত্তর, "অ্যাপ্লিকেশন। কেন তোর কী মনে হচ্ছে?"

আমরাও মুচকি হেসে ছোট করে সই করে দিলাম। তারপর রেঞ্জ অফিস থেকে যদ্দূর মনে পড়ে চারশো টাকার রসিদ কেটে নেওয়া হল। ওরা জানাল 'জয়পুর ওয়াচ টাওয়ার' এখান থেকে বাসে ঘন্টাখানেকের রাস্তা। রেঞ্জ অফিসের কাজ মিটিয়ে আবার বাস রাস্তায় এলাম। কিন্তু বিধি বাম। দোকান চা খেতে গিয়ে শুনলাম, আজ বিশ্বকর্মা পুজো বলে রাস্তায় বাস প্রায় নেই। অগত্যা বাকিদের অপেক্ষা করতে বলে, প্রসেন আর আমি গেলাম গাড়ির খোঁজে। স্ট্যান্ডে কোনও গাড়ি নেই। পথে

বৃষ্টি। কপালজোরে একটা টিনের শেড পেয়ে গেলাম দুজনে। মিনিট কুড়ি দাঁড়ানোর পর আবার যখন বাকিদের কাছে ফিরলাম, দেখলাম আমরা দুজন বাদে বাকি সবাই কাকভেজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অপেক্ষা করছে। আর ইতিমধ্যে একটা মোটর ভ্যানও যেতে রাজি হয়েছে। শুধু আমাদের দুজনের অপেক্ষায় বেচারারা খোলা ভ্যানে বসে ভিজেছে। বাপ্পার তুমুল গালাগালের তোড়ে আমাদের বৃষ্টিতে শেডের নিচে দাঁড়ানোর লজিক কোথায় ভেসে গেল! মোদ্দা কথা হল যেহেতু সবাই বৃষ্টিতে ভিজেছে তাই আমাদেরও ভিজে ভিজে ফেরা উচিত ছিল। আর কথা না বাড়িয়ে আমরা ভ্যানে চড়ে রওনা দিলাম। জুম্বাদা জিজ্ঞেস করল, "রাতের জন্য কি নেওয়া হবে?"
সুদীপ্তদা বলল, "হোয়াইট…" বাপ্পা চেঁচিয়ে বলল, "ওকে। ঠিক আছে।"
সুদীপ্তদা বলল, "তুমি আর চেঁচিও না। তুমি এক বর্ণও চেঁচাতে পারোনা!"
চিকু বলে উঠল, "কাকা… বাজারটা ঘুরে যেও। রাতের জন্য কেনাকাটা করতে হবে।"

কেনাকাটা সেরে আমরা রওনা দিলাম জয়পুরের উদ্দেশ্যে। চারিদিকে পিয়াল, শাল, মহুয়া, পলাশের জঙ্গল। জঙ্গলের বুক চিরে চলে গেছে কালো পিচঢালা রাস্তা। বৃষ্টিভেজা লাল মাটির সোঁদা গন্ধমেশা সবুজের হাতছানি। যতদূর দেখা যায় ফাঁকা রাস্তা… জনশূন্য। সবুজ যেন আরও ঘন হয়ে ঘিরে আসছে আমাদের গ্রাস করার জন্য। সেই পথের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুরু হল গান… সে গান মাটির গান…সবুজের গান।
জয়পুর রেঞ্জ অফিসে পৌঁছলাম তখন বাজে দেড়টা। মোটরভ্যানের টাকা পয়সা মিটিয়ে গেলাম রেঞ্জ অফিসে। রসিদ দেখানোর পর রেঞ্জ অফিস থেকে ওয়াচটাওয়ারের কেয়ারটেকার লক্ষ্মণদাকে দেওয়া হল আমাদের সঙ্গে। লক্ষ্মণদার থেকে ওয়াচটাওয়ারের রাস্তা জেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে বললাম। রাস্তার ধারের টালিছাওয়া খাবারের দোকানে ঢুকলাম। আধঘন্টার অপেক্ষার পর গোল চালের ধোঁয়াওঠা গরম ভাত, মুসুর ডাল আর আলুভাতে মাখা দিয়ে লাঞ্চ সারলাম। লাঞ্চ করে হাঁটা লাগালাম বাংলোর দিকে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় চওড়া পিচ রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে চললাম ডানহাতি লালমাটির রাস্তায়। আঁকাবাঁকা রাস্তা চলেছে কোনও গ্রামে। পাশে একটা সদ্যকাটা পুকুর, কয়েকটা জামরুল গাছ। রাস্তা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে 'জয়পুর ওয়াচ টাওয়ার', সামনে একটা ছোট্ট চমৎকার বাগান। পাশে খোলা মাঠ। ওয়াচ টাওয়ারের ঠিক পিছন থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। সেই নিবিড় অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জুম্বাদা, নিশ্চুপ। হারিয়ে গেছে কোন্ অসীমে। সেই অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্রোত যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমাদের।

লাঞ্চ হয়ে যাওয়ায় হাতে ছিল অগাধ সময়। একে একে স্নান সেরে এসে বসলাম আড্ডায়। নিখাদ, নির্ভেজাল বন্ধুত্বের সময়ের সঙ্গী হয়ে থাকতে। বাঙালির আড্ডার নিয়ম মেনেই এল গান, বিতর্ক, হাসি-মস্করা। আড্ডা দিতে দিতেই ঠিক হল একটু ল্যাদ খেয়ে বিকেলের দিকে জঙ্গলটা এক্সপ্লোর করতে বেরোনো হবে।
ওয়াচ টাওয়ারটা পাঁচতলা। নিচের তলায় লক্ষ্মণদার রান্নাঘর, তারপরের দুটো তলার প্রতিটাতে একটা করে রুম - দোয়েল আর শ্যামা। পরের তলায় তিনদিক খোলা ক্যাফেটেরিয়া আর তার ওপরে খোলা ছাদ। ছাদ থেকে নেমে বাগানে এলাম। বাগানের গাছ থেকে হাত বাড়িয়ে কিছু পেয়ারা পেড়ে নিয়ে চললাম জঙ্গল ভ্রমণে। সবুজ ঘাসেঢাকা মাঠে এসে খুব ক্রিকেট বা ফুটবল খেলতে ইচ্ছে করছিল। অগত্যা হাতের পেয়ারা ছুঁড়ে ক্যাচিং প্র্যাকটিস করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালাম। সময়ের কথা তখন খেয়াল ছিল না। সাড়ে চারটে কি পৌনে পাঁচটা হবে হয়তো। এরপর সূর্যও ডুবে যাবে। সুদীপ্তদা বলল, "চল আমরা একটু জঙ্গলটা এক্সপ্লোর করি।"
একে একে জঙ্গলে ঢুকলাম। কিছুটা ছাড়া ছাড়া হাঁটছি সবাই। গত কদিনের বৃষ্টিতে জঙ্গলের মাটি ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে। চারিদিকে শুধু পিয়াল, শাল, মহুয়া, সেগুন আর ইউক্যালিপ্টাসের ঘন জঙ্গল। কিছুটা ছাড়া ছাড়া গুল্মের ঝোপ। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় জঙ্গলটা যেন একটু বেশি জীবন্ত। ঘন ঘাসের বুকে আঁকাবাঁকা পায়েচলা শুঁড়িপথ। কাদায় গবাদি পশুদের পায়ের ছাপ। বেশ কিছু জায়গায় চোখে পড়ল উইঢিপি আর পিঁপড়ের বাসা। দুপুরে লক্ষ্মণদার মুখে শুনেছিলাম এই জঙ্গলে মাঝেমধ্যেই হরিণ আর হাতির পাল চোখে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম দেখা পেলে মন্দ হয় না। বাপ্পা একটু আলাদা হাঁটছিল। বাপ্পার চিৎকারে সবাই ছুটে গেলাম ওর দিকে। সম্ভবত কিছু একটা দেখেছে। মাটিতে একটা বড়সড় পায়ের ছাপ। বাপ্পা জিজ্ঞেস করল "সুদীপ্তদা এটা কি হাতির পায়ের ছাপ?"

সুদীপ্তদা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "এরকম এক ঠ্যাং-এর হাতি তো হয় না রে! এটা কোন মোষের একটা পা হড়কে গর্তে পড়েছে সেই দাগ। আর বাকি দাগগুলো যথারীতি মোষের খুরের।" আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। আকাশে তখন গোধূলির রং লেগেছে। জঙ্গল জুড়ে পাখপাখালির ঘরে ফেরার গান। জুম্বাদা উদাত্ত কন্ঠে শুরু করল, "আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...", একে একে গলা মেলালাম সবাই। সন্ধ্যে ঘনাতে শুরু করেছে। প্রসেন সাবধানী গলায় বলল, "আমাদের এবার ফেরা উচিত।" অন্ধকারে দিশাহীনভাবে এদিক ওদিক করার পর বোঝা গেল, ঘন জঙ্গলে আমরা পথ হারিয়েছি। একটু একটু ভয় যে লাগেনি তা নয়... এর মাঝে জুম্বাদা বলে উঠল, "আমি যেখানে আছি সেখানে তোদের ভয় কী!" শুনে সুদীপ্তদা চাপা গলায় বলল, "আমরা রবিনহুডকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি রে পাগলা ।" ধীরে ধীরে অন্ধকার গ্রাস করে নিল আমাদের। অন্ধকার নামতেই জঙ্গল যেন আরও ঘন হয়ে এল, সেভাবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না একে অপরকে। ঝিঁঝিঁর ডাক আরও তীব্র হয়ে উঠল। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাওয়া আকাশ খানিকটা সাদাটে, বাকি নিকষ কালো অন্ধকার। মোবাইল রেখে এসেছি ওয়াচ টাওয়ারে। সেই অর্থে সভ্যতার সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। চিকুর কাছে ছিল ডিজিটাল ক্যামেরা। সেটার ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে ছবি তোলা হল। ছবি জুম করে দেখতে বহুদূরে একটা ছাউনিগোছের কিছু চোখে পড়ল। সেদিকেই হাঁটা লাগালাম। বনবিভাগের বানানো বিশ্রামস্থল। তার মানে রাস্তা থেকে বেশি দূরে নেই। প্রায় এসে পড়েছি। বেশ আয়েশ করে বসে সিগারেট ধরালাম। আড্ডা চলল আরও কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ল রাতে কী খাওয়া হবে তা তো লক্ষ্মণদাকে জানানো হয়নি। তাই না চাইতেও উঠতে হল। জঙ্গল থেকে বেরোনোর সময় বুঝতে পারলাম আমরা পুরো উল্টোদিক দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। পথ হারিয়ে প্রায় একপাক ঘুরে নিয়েছি কিছুটা অংশে।
ওয়াচ টাওয়ারের সামনে গিয়ে দেখলাম গেটে তালা ঝোলানো। সাইকেল সমেত লক্ষ্মণদা বেপাত্তা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সাইকেলের বেল বাজিয়ে লক্ষ্মণদা ফিরল। একগাল হাসি হেসে বলল, "আপনাদের দেরি হচ্ছে দেখে এই বাজারটা করে নিয়ে এলাম। কী খাবেন কিছুই তো বলে যাননি। "
-"রাতে কি খাওয়াবে?" জিজ্ঞেস করলাম।
-"আজ্ঞে, আলু দিয়ে ডিমের ঝোল আর রুটি।"
-"ফাটাফাটি..", সবাই বলে উঠল। তারপর জুম্বাদা আর আমি লক্ষ্মণদার সাইকেল নিয়ে বাজারে গেলাম। মুড়ি আর গরমাগরম তেলেভাজায় জলখাবার সারা হল।

সান্ধ্য আসর বসল ছাদে। ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়ায়, মেঘ চাঁদের লুকোচুরি, ঝিঁঝিঁর কলতানের সেই বিচিত্র পরিবেশে আমাদের নির্ভেজাল আড্ডা চলেছিল অনেকক্ষণ। নৈশাহার ঢাকা রেখে দিয়ে লক্ষ্মণদা শুয়ে পড়েছিল। আজকের ব্যস্ত সময়ে বসে সেই সময়ের হিসেব মেলানো যায় না কিছুতেই। রাতে সবাই মিলে শুয়েছিলাম একটাই ঘরে, অন্য ঘরে রাখা ছিল আমাদের লাগেজ।

সকাল হল ঝমঝমে বৃষ্টিতে। ঝোড়ো হাওয়া মনটা কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। একদিনের জঙ্গলযাপনের অবকাশ ভুলে আবার ছকে বাঁধা জীবনে ফিরে যাওয়া। হুঁশ ফিরল লক্ষ্মণদার ডাকে। কাল রাতের খরচের হিসাবপত্তর নিয়ে হাজির। ক্যাশিয়ার প্রসেন-এর হাসিতে জানা গেল বিলের তারিখ ছয় মাস আগের। লক্ষ্মণদাকে জিজ্ঞেস করতে কাঁচুমাচু মুখে জানাল, "ওই একটিই বিল আছে বাবু। যা মনে করে দেবেন তাই সই।" সাদাসিধে ভালো মানুষ লক্ষ্মণদার টাকাপয়সা মিটিয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। সিম্পল মেনু ডিমটোস্ট। প্রাতরাশপর্ব মিটিয়ে একটু হাঁটতে বেরোলাম। আশপাশটা দেখার জন্য। নিঃশব্দে হাঁটছি সবাই। রাস্তার ধারে লজ্জাবতীর বনে গোলাপি ফুল ধরে আছে। জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে

ঘণ্টাদুই পর ফিরলাম। লক্ষ্মণদা বলল, "খাবার রেডি।" খেতে বসে কেউ কোনও কথা বলছে না। সবার মনখারাপ। জুম্বাদা বলল, "মনখারাপ করছিস কেন? আবার আসব এখানে, আর তখন তিন চারদিন থাকব।" দুপুর পৌনে দুটো... আমরা ব্যাগ কাঁধে বেরোচ্ছি। সবার ভীষণ মনখারাপ। বুকের ভিতরটা যেন কাঁদছে। বাংলো গেটের সামনে লক্ষ্মণদা দাঁড়িয়ে। ছল ছল চোখে বলল, "আবার আসবেন বাবুরা।"
প্রসেন হঠাৎ বলল, "পরেরবার মুদিখানার ফর্দটা চেঞ্জ কোরো কিন্তু... ", সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।
সেই মাটির রাস্তা ধরে গুটিগুটি পায়ে ফেরার পথ ধরলাম। পিছনে পড়ে থাকল শাল পিয়ালের নিবিড় জঙ্গল, দোয়েল, শ্যামা, সেই পেয়ারা গাছ, জয়পুর ওয়াচ টাওয়ার, অগণিত সবুজ স্মৃতি আর আমাদের অরণ্যের দিনরাত্রি।

তাপস মণ্ডল পেশায় বেসরকারি সংস্থার এক্সিকিউটিভ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় কাটে বই পড়ে। অন্যতম প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়। ভালোবাসেন ঘুরে বেড়াতে। বিশেষ করে অফবিট জায়গায়। এছাড়া গান শোনা ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া অন্যতম পছন্দের কাজ। লেখালিখির অল্পবিস্তর চর্চা থাকলেও কোন পত্রিকায় লেখা পাঠানো এই প্রথম।

ট্রেক ডায়েরি: সান্দাকফু - ফালুট

সুদীপ্ত ঘোষ

~ *সান্দাকফু ট্রেক রুটম্যাপ* || *সান্দাকফু ট্রেকের আরও ছবি* ~

শুরুর কথা :
#পাহাড়ে না করতে নেই

দিনকয়েকের ফোনালাপে ঠিক হল এবারের ট্রেক সান্দাকফু- ফালুট। বাইরে দূরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে বিশেষ নেই। কয়েকজনের অফিসে ছুটির সমস্যা, আবার কয়েকজনের এই পথে অনেকগুলো ট্রেক হয়ে গেছে। তাই আবার একই রুটে যেতে নারাজ। আবার অনেকে এই রুটে গাড়িতে ঘুরে এলেও এবার ট্রেকে যেতে চায়। তাই এইসব পক্ষে-বিপক্ষের মতামত, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, অফিস-ছুটির বিস্তর হিসেবনিকেশের পর সান্দাকফু- ফালুট- গোর্খে-ভারেং রুটটা ঠিক করা হল। এবারেও বেশকিছু বন্ধু নতুন। দীপেন, বিল্টুদার সঙ্গে এবার আমার প্রথম ট্রেক। টিকিট কাটার আগে বাপ্পা জানতে চাইল, "সুদীপ্তদা, পাপাই আর সুজিত যেতে পারে বলেছে, কী করব?"
"টিকিটটা আপাতত কেটে রাখ। আর পাহাড়ে কেউ সঙ্গে যেতে চাইলে না করতে নেই।"
১২ তারিখ সকালে আবার বাপ্পার ফোন, "শুভ যাবে বলছে...! কী করব? সব বুকিং তো হয়ে আছে?"
"কোনো চাপ নেই ভাই, সবাই অ্যাডজাস্ট করে নেব। ওকে যেতে বল। আর শোন, পাহাড়ে না করতে নেই।"
শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল সাড়ে এগারোটায়। দশজনের গ্রুপের ন'জন একসঙ্গে ট্রেনে চড়লাম। দীপেন ব্যক্তিগত কাজে উত্তরবঙ্গে, ও মালদহ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।
আমাদের প্রতিটা ট্রেকের জবরদস্ত শুরুটা হয় ট্রেনে ডিনার দিয়ে। তবে এবারেরটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল। লুচি, পরোটার সঙ্গে আলুভাজা, আলুর দম, চিকেন কষা, চিকেন কারি আর ঝাল ঝাল হাঁসের মাংস। শেষ পাতে সুজির হালুয়া, নলেন গুড়ের মাখা সন্দেশ আর মিল্ক কেক। ডিনার করে যে যার বার্থে চলে গেলাম। তবে আশপাশের লোকের উৎপাতে রাতে বিশেষ ঘুম হল না।

১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ (নিউ জলপাইগুড়ি থেকে চিত্রে):
#বাংলার শেষ নবাব

স্টেশনে পৌঁছালাম সাড়ে ন'টা নাগাদ। ট্রেন প্রায় রাইট টাইম। রুকস্যাক পিঠে হাঁটার শুরু। ওভারব্রিজের সিঁড়ি ভেঙে এসে উঠলাম ওয়েটিং রুমে। সকালের ট্রেনের বেশিরভাগ যাত্রী তাড়াতাড়ি পাহাড়ে পৌঁছাতে চায়। আমরা লেট লতিফ। তাই সকালের চা খেয়ে, খানিকটা ল্যাদ খেয়ে, ব্যাগপত্তর রেখে একে একে স্নান করে এলাম। ঠিক হল রাস্তায় কোথাও গাড়ি থামিয়ে ব্রাঞ্চ (ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ) করে নেওয়া হবে। লটবহর গাড়ির ছাদে বাঁধাছাঁদা সেরে চড়ে বসলাম গাড়িতে।
নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন, শহরের গলি-ঘুঁজি, শর্টকাটের গোলকধাঁধা ছাড়িয়ে গাড়ি চলল পাহাড়ের দিকে। আকাশে রোদ নেই। মেঘলা আকাশ। রাতের একপশলা বৃষ্টির পর সকালের বাতাসে একটু গুমোট ভাব। শহর পার করে ক্যান্টনমেন্টের সেই সবুজে ঘেরা মায়াবী রাস্তায় পৌঁছাতেই প্রাণে যেন এক ঝলক খোলা হাওয়া। পাহাড়ের আগে তরাইয়ের এই বনভূমি অনেকটা সেই দুর্গাপুজোর আগে মহালয়ার মতো। মনের মধ্যে লাফালাফি করে ওঠে অগুনতি চঞ্চল জলফড়িং। কিছুটা এগিয়ে একটা রোডসাইড হোটেলে গাড়ি থামিয়ে এক প্লেট করে চিকেন মোমো, পরোটা, চিকেন কারি দিয়ে ব্রাঞ্চ করে নেওয়া হল। তারপর গাড়ি চলল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে সেই পাইনের সারি, চা বাগান, সেই চেনা ভালোবাসা। মিরিক, থারবো চা বাগান, তাবাকোশী, সুখিয়া পোখরি পার হয়ে সীমানা। এখান থেকে নেপালের অনেকটা দেখা যায়। একটা ছোট ভিউ পয়েন্ট আছে। আবার কিছুক্ষণের বিরতি। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ির দরজা খুলতেই বাইরে অপেক্ষমান ঠান্ডা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। লাকি, বাবুকা, শুভ সীমানা বাজার থেকে গ্লাভস, টুপি কিনল। বেশ সুন্দর। এক কাপ করে গরম চা খেলাম। তারপর আবার পথ চলা। মানেভঞ্জন পৌঁছতে হবে বিকেল চারটের মধ্যে। তারপরে গেলে সিঙ্গালিলা ন্যাশানাল পার্কের পারমিট পাওয়া যাবে না। বৃষ্টির জন্য রাস্তা একটু ভেজা। সাবধানে গাড়ি চলছে। তাই কোনোভাবেই ঠিক সময়ে পৌঁছানো গেল না। মানেভঞ্জন পৌঁছে সমতলের গাড়ি ছেড়ে দেওয়া

মানেভঞ্জন থেকে চিত্রে দুই কিলোমিটার। আমাদের আগের প্ল্যান অনুযায়ী সেটা ল্যান্ড রোভারে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ায় সেটা আর সম্ভব হল না। অগত্যা গাইড যোগেশ ভাইয়ের কথামতো রুকস্যাক কাঁধে হাঁটা শুরু করলাম। অদ্ভুত সেই শর্টকাট রাস্তা, কারও উঠোন, কারও বাগান, কারও সিঁড়ি বেয়ে খাড়াই উঠে চললাম। মানেভঞ্জন পার হয়ে একটা গাড়ি পাওয়া গেল, সেটাতে আমাদের লাগেজ তুলে দেওয়া হল। সঙ্গে দীপেন, বাবুকা আর পাপাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।
শুরুর দিনের ট্রেকের ওয়ার্ম আপ শেষ করে যখন চিত্রে পৌঁছলাম ঘড়িতে প্রায় পৌনে পাঁচটা। কুয়াশায় মোড়া পাহাড় ঘিরে মনকেমনের এক বিকেল নেমে এসেছে। আমাদের রাতের আস্তানা 'হোটেল হক'স নেস্ট'। যে যার মত গ্রুপ বানিয়ে রুম দখল করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। ডাইনিংয়ে বসতেই চলে এল গরম ম্যাগির বোউল। সেই ম্যাগির গুণে কিনা জানি না...শুভ'র মেজাজ তখন তূরীয়। নবাবী কেতায় আধশোয়া শুভ তখন সিরাজের থেকে কোনো অংশে কম নয়। ট্রেকের একটা উদ্দেশ্য যদি পাহাড় প্রেম হয়, অন্যটা অবশ্যই নিখাদ আড্ডা। প্রতিদিন হাঁটার ক্লান্তি ভুলতে যার কোনো বিকল্প নেই। রাতে ডিনারে ছিল ভাত, রুটি, ডাল, স্কোয়াশের সবজি, ডিমভাজা আর পাঁপড়ভাজা। ডিনারশেষে বাইরে বেরোতে ডিসেম্বরের ঠান্ডা তার উপস্থিতি জানান দিল। সন্ধের বিষণ্ণতা কাটিয়ে ঝকঝকে রাতের আকাশ।

১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ (চিত্রে থেকে টোংলু):
#লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন
সকালের তেরচা রোদ জানলার কাঁচ ছুঁয়ে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে এল। দুটো ভারী কম্বলের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুভ আর বাপ্পা। অন্য খাটে বাবুকা। স্লিপিং ব্যাগের চেন খুলে বাইরে এলাম। বাকিরা অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে গেছে সূর্যোদয় দেখতে। একটু চড়াই ভাঙলেই 'সশস্ত্র সীমা বল'-এর সেনা ছাউনির পাশ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। প্রবল ঠান্ডায় আমাদের আজ উঠতে ইচ্ছা করছিল না। জানলার স্লাইডিং কাঁচে পাতলা বরফের স্তর। ডাইনিং হলে গিয়ে এক কাপ গরম চা খেলাম। অসাধারণ ফ্লেভার। বাইরের রোদে ভেজা সকালে হলুদ ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু বরফ কণা। পাকদণ্ডী বেয়ে একটু নিচেই চিত্রে মনাস্ট্রি। বাবুকা আর সুজিতের সঙ্গে চললাম।

খানিক নেমে একটা বৌদ্ধ স্তূপ। রঙিন প্রেয়ার ফ্ল্যাগ ঝোলানো। হাতে জপমালা নিয়ে প্রদক্ষিণরত এক স্থানীয় রমণী। মৃদু হেসে ইশারায় আমাদেরও তাই করতে বললেন। নতমস্তকে প্রদক্ষিণ করলাম। স্তূপ থেকে সিমেন্ট বাঁধানো একফালি রাস্তা নেমে গেছে মনাস্ট্রিতে। নীল আকাশে একটু একটু করে জমতে শুরু করেছে চিন্তার মেঘ। মনাস্ট্রি ঘুরে দ্রুতপায়ে ফেরত এলাম।

কেক, চিঁড়েভাজা, চা দিয়ে জলযোগ করে বেরোনো হল। যোগেশ ভাই, আমাদের দশকর্ম্মা ভাণ্ডারের মত শুকনো খাবারের প্রকান্ড ব্যাগটা টংলুর দিকে যাওয়া গাড়িতে তুলে দিল। এখানে বলে রাখি খরচ কমাতে কিছু শুকনো খাবার আমরা বহন করি। কিন্তু এই পথে এত গাড়ি চলে যে সেই বাড়তি লাগেজ এবার প্রায় বইতেই হয়নি।
যোগেশ ভাইকে শুরুতেই জানিয়ে দিলাম, আমরা গাড়ি চলার রাস্তায় হাঁটতে নারাজ। সেইমত চিত্রে থেকে পিচঢালা রাস্তা ফেলে বাঁদিকের সোজা খাড়াই পাকদন্ডি বেয়ে চলা শুরু হল। সবার আগে বাবুকা আর দীপেন। আগের দিনের দুই কিলোমিটারের ওয়ার্ম আপ ট্রেকের কল্যাণে সবাই ফিট। শুধু আকাশ মেঘে ঢাকা। চিত্রে থেকে চড়াই খুব বেশি নেই। আঁকাবাঁকা পায়ে চলা ঘাস জমি। গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি সবাই। পথটা বেশ মজাদার, একদিকে নেপাল, অন্যদিকে ভারতবর্ষ। রাস্তাও দুই দেশের রাজনৈতিক সীমানাকে তোয়াক্কা না করে কখনও ভারতে, কখনও বা নেপালে ঢুকে গেছে।

দেখতে দেখতে লামেধুরা গ্রাম। মেঘ কুয়াশায় ঢাকা। টাল খেয়ে আসা পিচঢালা রাস্তাটা বাঁক ঘুরে হারিয়ে গেছে পাহাড়ের

অবাধ্য, এলোমেলো হাওয়া বইছে পাহাড় জুড়ে। মেঘ, কুয়াশার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এগিয়ে চলেছি। ঢালু গড়ানে জমির শেষে একটা পোখরি (পুকুর), ঘন কালো জল। দেখেই বসতে ইচ্ছে করল। আবার চকোলেট ব্রেক। তবে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট না করে আবার এগোলাম। মেঘমা পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর আড়াইটে বেজে গেল। রাস্তার বাঁদিকে মনাস্ট্রি। ডান দিকে পাহাড়ের ঢালে টিনের শেডের কটেজ টাইপের একটা গেস্টহাউস। মনখারাপের মেঘেরা আলগোছে কার্নিস ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেঘমাতে দুপুরের লাঞ্চ। ট্রেকে হাঁটার সময় কখনও হেভি লাঞ্চ করা হয় না সাধারণত, কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হল। গরম ভাত, ডাল, পাঁপড়ভাজা দেখে বাঙালি লোভ সামলাতে পারলো না। সঙ্গে গ্লাসভর্তি রডোডেন্ড্রন ওয়াইন। ভুল করলে ফল তো ভুগতে হবেই। তাই মেঘমা পেরিয়ে চড়াইয়ে উঠতে সবার দম বেরিয়ে গেল। পিঠের স্যাক যেন পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। তবে একটু চড়াই ভেঙে উঠতেই মেঘ সরিয়ে শেষ বিকেলের নরম রোদ বেরিয়ে এল। স্নেহাশিস চিৎকার করে বলল, "সবাই পা চালাও... টংলু থেকে সানসেট দেখব।"

পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই বিকেলের কমলা রোদে শায়িত 'ঘুমন্ত বুদ্ধ'। যার টানে বারবার ছুটে আসা। পাপাই-এর ক্যামেরার শাটার থামছে না। আমার পকেট থেকে ক্যামেরা বার করতে গিয়ে অসাবধানে পড়ে গেল কিছু টাকা। নিমেষে দমকা বাতাস উড়িয়ে নিল সেগুলো। লাকি চিৎকার করে উঠল, "কাকার টাকা...।" ছ'খানা পাঁচশো টাকার নোট বাতাসে ভাসতে ভাসতে চোখের সামনে কাঁটাতার পেরিয়ে উড়ে গেল খাদের দিকে। গৌরী সেনের মত টাকা ওড়ানোর চিন্তা আমাদের আটপৌরে জীবনে নেহাতই কষ্টকল্পনা। কিন্তু শায়িত 'ঘুমন্ত বুদ্ধের' সামনে ওই টাকার প্রতি আর মায়া জাগল না। অনেক কষ্টে পাপাই, শুভ আর লাকিকে নিচে নামা থেকে নিরস্ত করলাম। বিপদে মুশকিল আসান হল যোগেশ ভাই, আমার বাধা সত্ত্বেও কাঁটাতার টপকে নিচের ঝোপ থেকে উদ্ধার করে আনলো টাকাগুলো।
একটু এগিয়ে টংলুর 'ট্রেকার্স হাট'। আমরা রাস্তায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অস্তরাগের আলোয় স্থবির। বেলাশেষের রবিকে সঙ্গ দেওয়ার পালা সাঙ্গ হতেই ডিসেম্বরের ঠান্ডা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। ট্রেকার্স হাটের দুটো ঘর দখল করে রাজত্ব কায়েম করলাম। অনেক অনুরোধে রাতের খাবার সময় আটটা থেকে পিছিয়ে সাড়ে আটটা করা হল। আড্ডা সাঙ্গ করে বাইরে এলাম যখন, তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে। রাতের মেনু চমরী গাইয়ের দুধের ঘি দিয়ে খিচুড়ি সঙ্গে পাঁপড়ভাজা আর ঝাল আচার। ডিনার সেরে যে যার কম্বলের তলায় ঢুকে পড়লাম।

১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ (টংলু থেকে কালিপোখরি):
#সামনের বাঁক ঘুরেই...
কাকভোরে বিছানা ছেড়ে সদলবলে সামনের ভিউ পয়েন্টে চড়ে বসলাম। ডিসেম্বরের পাহাড়ি শীত তার একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করতে নারাজ। সঙ্গে দোসর মাতাল হাওয়া। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে আর কী...! তবে বাঙালি চিরকালই 'আউট অফ দ্য বক্স' ভেবে এসেছে... তাই বাপ্পা যখন 'ট্রেকার্স হাটের' কম্বল গায়ে জড়িয়ে পাহাড় চড়ল, তখন কেউই খুব একটা অবাক হল না। কাঞ্চনজঙ্ঘা ছুঁয়ে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে।

শুরু হল আরও একটা দিন। দূরে বাঁদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে রাস্তা। টুমলিং হয়ে কালিপোখরির দিকে।

আজ আকাশ একটু বেশিই খোশমেজাজে। দূরদূরান্তে মেঘের চিহ্ন নেই। চায়ের কাপের ধূমায়িত বাষ্পেরা স্বচ্ছন্দে হারিয়ে যাচ্ছে ব্যাকড্রপের কাঞ্চনজঙ্ঘায়। ট্রেকার্স হাটের কাঁচের জানলায় লেগে থাকা জলীয় বাষ্পরা বিন্দু বিন্দু জলকণার আকারে গড়ে নিচ্ছে নিজেদের। বাইরে নাম না জানা সহস্র পাখির ডাক। কোনও এক হারিয়ে যাওয়ার সকাল। যে আনমনা সকালে সব হিসেবে ভুল করতে ইচ্ছে হয়...

টংলু থেকে টুমলিং দুই কিলোমিটারের আশেপাশে। খুব বেশি চড়াই উতরাই নেই। নটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম টুমলিং। সামনে ঝকঝকে 'ঘুমন্ত বুদ্ধ'। এখানে অনেকগুলো হোটেল, লজ। ট্যুরিস্টদের ভিড়। নুডুলস, স্যুপ আর মোমো মিলিয়ে ব্রেকফাস্টটা মন্দ হল না। প্রাতরাশপর্ব মিটিয়ে আবার পথে নামলাম। বাবুকা'র পৈটিক গোলযোগ। বেশি ঘি খাওয়ায় চমরী গাই বেজায় খাপ্পা হয়ে পেটের মধ্যে হুলুস্থুল কান্ড বাধাচ্ছে নির্ঘাত। যোগেশ ভাই করিতকর্মা লোক, গতিক বুঝে কালিপোখরিগামী গাড়িতে বাবুকাকে বসিয়ে দিল। আর আমরা লাট খেতে খেতে এগিয়ে চললাম কালিপোখরির দিকে।
কিছুটা এগিয়ে সিঙ্গালিলা ন্যশানাল পার্কের চেকপোস্ট। নিয়মমাফিক পারমিট করিয়ে নেওয়া হল। চারজনের একটা ছোট গ্রুপ একটু বিপদে পড়েছে। সঙ্গে গাইড না থাকায়, কিছুতেই পারমিশন পাচ্ছে না। যোগেশ ভাই নিজেকে ওদের গাইড পরিচয় দিয়ে পারমিট করিয়ে দিল। আমরাও নিজেদের দল বাড়িয়ে নিলাম।

বড় রাস্তা ছেড়ে সরু পায়ে চলা জঙ্গলের পথ। পাইন, ওক, রডোডেন্ড্রনের ঘন জঙ্গল। ছোট ছোট গুল্মের ঝোপে লাল বেরি জাতীয় ফল। পাহাড়ের রিজ বরাবর রাস্তা, মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে বিশেষ বৈরিতা নেই। বিস্তৃত ঘাসজমিতে মাঝে মধ্যের

গৈরিবাস অবধি হাঁটাতে বিশেষ কষ্ট হয়নি। কিন্তু তারপরই শুরু হল চড়াই। পাহাড়ের খামখেয়ালি আবহাওয়া সকালের একেবারে বিপ্রতীপ। একে চড়াইয়ের কষ্ট তারপরে শীতের কামড় শরীরকে নিমেষে কাবু করে দিল। ক্লান্ত শরীর টেনে নিয়ে চললাম কাইয়াকাট্টার দিকে।
গুটিকয় বাড়ি আর তার সংলগ্ন দোকান নিয়ে কাইয়াকাট্টা। একটা ছোট জনপদ। আজকের লাঞ্চ কাইয়াকাট্টায়। আগেই 'ইন্ডিয়া হাইকসে'র' বড় টীম ঢুকেছে। তাই না চাইতেও আমাদের অনেকটা দেরী হয়ে গেল। নুডুলস আর স্যুপ দিয়ে লাঞ্চ সারা হল। রুকস্যাক কাঁধে নিয়ে নির্জন পাহাড়ি জনপদকে আবার নির্জন করে দিয়ে এগিয়ে চললাম কালিপোখরির দিকে। পিছনে পথের পাশে একলা পড়ে থাকল কাইয়াকাট্টা।

কাইয়াকাট্টা থেকে কালিপোখরির রাস্তায় চড়াই বিশেষ নেই। কিন্তু সারাদিনের হাঁটার ক্লান্তি, সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার দাপট। পা চলতে চাইছে না। পাপাই জিজ্ঞেস করল, "আর কতটা...?"
বাপ্পার কনফিডেন্ট উত্তর, "এই তো এসে গেছি। সামনের বাঁক ঘুরেই কালিপোখোরি।"
পাপাইয়ের এটা প্রথম ট্রেক। আমদের গ্রুপের কনিষ্ঠতম সদস্য। আর বাপ্পা এই রাস্তায় বহুবার এসেছে। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে পাপাই এগিয়ে চলল। পরপর তিনটে বাঁক ঘোরার পরও দেখা গেল কালিপোখরি তখনও প্রায় এক কিলোমিটার...! বাকি রাস্তায় বাপ্পা আর পাপাইয়ের দিকে তাকাতে সাহস করে নি।

কালিপোখরির দিকে যত এগোচ্ছি কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার দাপট তত বেড়ে চলেছে। পথের ধারে মাঝে মধ্যে ঝরনার জল জমে বরফ হয়ে আছে। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে টাল সামলানো দায়। প্রায় অন্ধকার রাস্তায় হেঁটে চলেছি কোনো এক অনন্তের উদ্দেশ্যে। কালিপোখরি পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধে নেমে এল।

রাত্রির মতো তমসাচ্ছন্ন এক জলাশয়। সন্ধ্যার স্বল্পালোকে সাদা চোর্তেনগুলো খানিক রহস্যাবৃত। পশ্চিমদিকের উপত্যকা জুড়ে গোধূলির আলোয় ঈষৎ রক্তাভ তরঙ্গায়িত মেঘমালা, কোনও এক অলীক মহার্ণবের। অন্ধকার ঘনাতে রাতের আস্তানায় ফিরলাম। হাওয়ার দাপটে কাঠের কটেজ ঠকঠক করে কাঁপছে। জানলার ফাঁক গলে বর্শার ফলার মত আক্রমণ শানাচ্ছে নিষ্ঠুর হিমেল বাতাস। হাওয়ার গুন্ডাগিরি থেকে বাঁচতে ফাঁকা জায়গাগুলো কাগজ, সেলোটেপ দিয়ে সিল করে দেওয়া হল। প্রবল ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি সবাই। রান্নাঘরের সংলগ্ন ডাইনিং-এ আড্ডা জমালাম। এক কাপ অসাধারণ মশলা চা আর আন্টির আন্তরিক ব্যবহারের উষ্ণতায় কষ্ট অনেকখানি কমে গেল। কাঠকয়লার গনগনে আগুনের তাপে রক্ত সঞ্চালন একটু স্বাভাবিক হল। রাতের ডিনারের পর আর বাইরে থাকা সম্ভব হল না।

১৬ ডিসেম্বর, ২০২০ (কালিপোখরি থেকে সান্দাকফু):
#এ বাতাসে বিস্ নাই...

কালিপোখরি থেকে সান্দাকফু ছয় কিলোমিটার। সকালে স্যুপি-নুডলস আর দার্জিলিং-চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে হাঁটতে শুরু করলাম। কাজল কালো মেঘে ঢাকা রহস্যময়ী কালিপোখরি পিছনে রয়ে গেল অন্য পথিকের অপেক্ষায়। রাস্তা জুড়ে ইতঃস্তত বরফ জমা। জানলার কার্নিসে, ছাদের টিনের শেডে লেগে থাকা গত রাতের শীতের প্রলেপ সকালের রোদের প্রতীক্ষায়। রাতের অসহনীয় ঠান্ডা রবির পরশে একটু গা-সওয়া। সিঙ্গালিলা ন্যাশানাল পার্কের বুক চিরে চলেছে রাস্তা। দুপাশে ওক, ম্যাপল, পাইনের ভিড়। পাখিরা ব্যস্ত ঘরগেরস্তালিতে। তাদের প্রাত্যহিকী বার্তালাপে মুখরিত হিমালয়। কখনও পাহাড়ের রিজ বরাবর রাস্তা। দুপাশে রডোডেন্ড্রনের জঙ্গল। রাস্তার বাঁকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। অপার্থিব। নীল আকাশ, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সাক্ষী রেখে ফ্রেমবন্দী হল আমাদের একমাত্র গ্রুপফটো। বিকেভঞ্জন পর্যন্ত রাস্তায় প্রকৃতির অসংখ্য মণি-মুক্তো ছড়ানো। এক এক করে কুড়িয়ে নিলাম সেসব, ভরে নিলাম স্মৃতির ঝুলি। বিকেভঞ্জন পৌঁছে আবার চায়ের বিরতি।

বিকেভঞ্জন শব্দের আক্ষরিক অর্থ বিষাক্ত উপত্যকা। বিষাক্ত অ্যাকোনাইট গোত্রের উদ্ভিদের আধিক্যের জন্য এমন অদ্ভুত নামকরণ। এখান থেকে সান্দাকফু চার কিলোমিটার। বাকি রাস্তায় কেবল চড়াই আর চড়াই। রাস্তা যত দুর্গম, প্রকৃতি তত সুন্দর। ওকের পাতায় পিছলে যাচ্ছে সূর্যালোক। কাঞ্চনজঙ্ঘা ছুঁয়ে পাইন বনের পথ ধরে ছুটছে বাতাস। প্রাণভরে মাখছি পাহাড়। সমতলের ফুসফুস, পাহাড়ের চড়াইয়ে বেদম। কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলছে পাহাড়ি হাওয়া, 'অফুরন্ত অক্সিজেন...শ্বাস নাও প্রাণ ভরে। এ বাতাসে বিস্ নাই লালমোহান বাবু...!!' সামনে গতকাল দেখা হওয়া 'ইন্ডিয়া হাইকসের' বিরাট দল। পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে বাঁকে হাঁটছে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। আমরা বরাবরের মত রাস্তা ছেড়ে দুরূহ শর্টকাটে। শর্টকাটের কল্যাণে পেরিয়ে গেলাম ওদের। বুকে হাপর টানছে। অবশেষে দেখা যাচ্ছে 'শেরপা শ্যালে'। আবার নতুন উদ্যমে হাঁটা... দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম সান্দাকফু। বাংলার উচ্চতম স্থান। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাঁচটি শৃঙ্গের চারটিই চোখের সামনে। ভিউপয়েন্ট থেকে একবার 'ঘুমন্ত বুদ্ধের' দর্শন সেরে চললাম হোটেলের দিকে।
দুপুরে লাঞ্চ করে আবার বাইরে উদ্দেশ্যহীনভাবে একটু হেঁটে নিলাম। কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা আর প্রবল হাওয়ায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো দায়। চললাম ভিউপয়েন্টের দিকে। যদিও গোটা জায়গাটাই ভিউ পয়েন্ট। প্রায় সবখান থেকেই সবকটা শৃঙ্গ দেখা যায়। ভিউপয়েন্টে কাচেঘেরা ছোট একটি ঘর। সেখানে মোবাইলের নেটওয়ার্কও পাওয়া যায়। সেই ঘরেই চললাম সবাই। গল্পের ফাঁকে দিন ফুরিয়ে এল। মন ভরে গেল শেষ বিকেলে। মেটে সিঁদুরগোলা, একলা পাখির ঘরে ফেরা আকাশের সীমানায় দাঁড়িয়ে তুষারশৃঙ্গরাজি। সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। নিয়ম মেনে জমাট বাঁধল অন্ধকার। সান্দাকফু থেকে জোছনা রাতের সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্যতই কোনো সুদূর কল্পলোকের। রাত গভীর হল।

১৭ ডিসেম্বর, ২০২০ (সান্দাকফু থেকে ফালুট):
#হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা...

দরজায় টোকার শব্দে ঘুম ভাঙল। স্লিপিং ব্যাগের চেন খুলতেই বাইরের ডিপ ফ্রিজের ঠান্ডা মুচকি হেসে গুডমর্নিং বলল। আপাদমস্তক ঢেকে বেরিয়ে পড়লাম সবাই। প্রবল ঠান্ডায় হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

পুব আকাশে তখন রক্তিম আভা। সামনে সদলবলে কাঞ্চনজঙ্ঘা। কুম্ভকর্ণ থেকে পান্ডিম...সবাই তৈরি দিনের আলো বুক পেতে নিতে। সামনেই গোলাপি আবিরমাখা কাঞ্চন। একটু বাঁদিকে অপেক্ষায় তিন বোন (থ্রি সিস্টার্স – লোৎসে, মাউন্ট এভারেস্ট, মাকালু)। এক এক করে প্রথম আলো ছুঁয়ে গেল সবাইকে। জেগে উঠল হিমালয়। সন্ধের ঘরে ফেরা পাখির দল আবার ডানা মেলল আকাশে। এক নতুন দিনের সন্ধানে।

সান্দাকফু থেকে ফালুট একুশ কিলোমিটার। পথে পড়বে সাবারগ্রাম। সেটাও প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার। গোটা রাস্তায় কোথাও কিছু নেই। নেই কোনো জলের ব্যবস্থাও। প্যাকড লাঞ্চ নিয়ে শুরু হল পথচলা। সান্দাকফু থেকে আলেতে পৌঁছে দেখলাম ক্যাম্পসাইটের তাঁবু তখনও গোটানো হয়নি। সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। এগিয়ে চললাম। সান্দাকফু থেকে সাবারগ্রামের রাস্তা বড় মোহময়। শুরুতে কিছুটা উতরাইয়ে নেমে শুকনো ঘাসে ঢাকা তৃণভূমি, মাঝে মধ্যে সবুজ পাইন, ফার। হাওয়ার বেগ যেখানে প্রবল, জীবিত গাছের সংখ্যা সেখানে নেহাতই নগণ্য। বজ্রপাতে জ্বলে যাওয়া গাছ, তুষারপাতের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ন্যাড়ামাথা গাছের সংখ্যাই বেশি। ভেঙে পড়া গাছের মাথায় বাসা বেঁধেছে হিমালয়ান ঈগল।

ছিদ্রপথে প্রবাহিত হয়ে তুলছে বাঁশির অলীক সুরের মুর্ছনা। সামনে অনন্ত দিগন্তরেখায় হিমালয়। উত্তরের অতন্দ্র প্রহরী। হয়ত সেই হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। হেঁটে চলেছি আমরা... সম্মোহিতের মত।

পথে পড়ল পশুপালকদের কিছু অস্থায়ী ছাউনি। বরফজমা পাহাড়ি নালা। ঘাসজমিতে চড়ে বেড়ানো ইয়াক। আমরা হেঁটে চলেছি ... যেন সেই কোন আদিকাল থেকে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। সঙ্গে বয়ে আনা জল প্রায় শেষ। সাবধানে শেষ কয়েক বিন্দু বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা। একসময় মুখে হাসি ফোটে। যোগেশ ভাই জানাল, সামনে এক ঝরনায় জল পাওয়া যেতে পারে। একদল তৃষ্ণার্ত চাতককে ফেলে রেখে বাপ্পা আর যোগেশ ভাই সরু পাকদন্ডী বেয়ে জঙ্গলের পথে হারিয়ে গেল। এক অন্তহীন অপেক্ষা। অবশেষে দুজনের দুহাত ভর্তি জলের বোতল দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। আমাদের চাওয়াপাওয়াগুলো হয়ত আদতে খুবই নগণ্য। কী জানি!

সাবারগ্রাম পৌঁছে একটু বিরতি। লজেন্স, চকোলেট, গ্লুকোজ জল দিয়ে শরীরে শর্করার ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা। সবরগ্রাম

পৌঁছানোর আগে শেষ চড়াইয়ের শরীর আর চলতে চায় না। হাত পা ছড়িয়ে দম নিচ্ছি সবাই। শেষ বিকেলের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। একটু দূরের ফালুটে একমাত্র ট্রেকার্স হাট ঘিরে এক বিষণ্ন, বয়স্ক বিকেল ঢলে পড়ছে সন্ধ্যের কোলে।

১৮ ডিসেম্বর, ২০২০ (ফালুট থেকে গোর্খে):
#আমরা বাঙালী জাতি!!!

রাতে ভালো ঘুম হল না। ট্রেকার্স হাটের কাঠের মেঝে, জানলার পাল্লা, সিলিং-এর ফাঁক গলে ঢুকে পড়ল ছিদ্রান্বেষী ঠান্ডা। জানলার কাচে হাওয়ার প্রবল আস্ফালন। এক এক করে উঠে পড়লাম সবাই। ট্রেকার্স হাটের সামনের চড়াই ভেঙে পৌঁছে গেলাম ভিউ পয়েন্ট। প্রচন্ড ঠান্ডায় চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। হাওয়ার দিকে পিঠ করে বসলাম। সেজে উঠছে চরাচর। 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও গো এবার...' - গোলাপি তুলির টানে রাঙিয়ে দিল সে। রঙিন প্রেয়ার ফ্ল্যাগের মন্ত্রগুলো প্রার্থনাসঙ্গীত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দূরদূরান্তে।

ফালুট থেকে গোর্খে প্রায় পনেরো কিলোমিটার। কিন্তু পুরোটাই প্রায় উতরাইয়ে। সুতরাং হাঁটার কষ্ট এবং সময় দুইই কম লাগবে। বাইরে বেরিয়ে দেখি দুই কিশোরী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পিঠে স্কুল ব্যাগ। ল্যান্ড রোভারে এসে পৌঁছেছে কিছু আগে। গোর্খে যাবে। ঘন জঙ্গলের পথে একসঙ্গে যেতে চায়। উতরাইয়ে নেমে চললাম। ঘন, গহীন পাইন বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি। দমকা বাতাসে বাঁশের জঙ্গলে অদ্ভুত সুরের হিল্লোল। কিছুটা অতিপ্রাকৃত।
একটানা হেঁটে চলেছি। বাকিদের থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি আমরা। আমি, বিল্টুদা, শুভ, লাকি আর পাপাই। সামনের দুই পাহাড়ি কন্যা চঞ্চল প্রজাপতির মত উড়ে চলেছে। পিছনে গড়াতে গড়াতে আমরা। হৃদপিণ্ডের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি বোধহয়। হাল দেখে মেয়ে দুটোর নিশ্চিত করুণা হল। বসে পড়লাম। ভাগ করে চকোলেট, জল খাওয়া হল। উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু মেয়ে দুটো ব্যাগকাঁধে তৈরি। ওদের এগোতে বলে আর একটু ল্যাদ খাব ভাবছি... বিল্টুদা বলে উঠল, "আমরা বাঙালি। ক্ষুদিরাম, নেতাজী কত বীর বিপ্লবীর রক্ত বইছে আমাদের ধমনীতে। আমরা ক্লান্তির কাছে হেরে যাব? জাগো বাঙালি জাগো।" উঠে দাঁড়াল বাঙালি! বীরদর্পে আর কোথাও ল্যাদ না খেয়ে বাকিদের থেকে পৌনে দুঘন্টা আগে পৌঁছে গেলাম গোর্খে। জি.টি.এ ট্রেকার্স হাটের দোতলার দুটো ডর্মিটারিতে আমাদের লাগেজ রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

ছবির মত সাজানো গ্রাম। ঘন পাইন বনের মাঝে গোর্খে নদীর তীরে গুটিকয় বসতি। একটা ট্রেকার্স হাট। বেশ কয়েকটা হোমস্টে। দূরে একটা ওয়াচ টাওয়ার। পাহাড়ের গায়ে ধাপি কেটে বানানো চাষের জমি। রেলিংঘেরা কাঠের ছোট ছোট রঙিন বাহারি ঘরের সামনে কেয়ারি করা বাগান। আলগোছে বেড়ে ওঠা স্কোয়াশের লতা। ছোট একফালি ক্ষেতে টম্যাটো ফলে আছে। পায়ে চলা একলা রাস্তা সবার দুয়ার ছুঁয়ে বনের পথে মিলিয়ে গেছে। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম সেটি। উপত্যকা জুড়ে নদী প্রবাহের ছান্দিক অনুরণন। দূরে পাইনবনের কোণ ঘেঁষে একটুকরো মেঘ ছেঁড়া ঘুড়ির মত লাট খাচ্ছে। বাতাসে খুশির ছোঁয়া। কেন জানি মনে হয় এই গ্রামে দুঃখ থাকতে পারে না!
দুপুরের লাঞ্চে ভাত, ডাল, আলুভাজা আর কপির তরকারি। অনেকদিন পর খোশগল্পে কাটল সারা দুপুর। রাতে বনফায়ারে গান আর দেশি মুরগির স্বাদ হয়ত সারা জীবন মনে থাকবে।

১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ (গোর্খে থেকে সামানদিন):
#মোরিনহো বনাম গুয়ার্দিওলা

অনেকদিন পর সকালে ওঠার কোনো তাড়া নেই। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পরই সকাল সকাল ঘুম ভাঙে। বরাবরের অভ্যেস। এবারও তাই হল। খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল। গোটা পাহাড় জুড়ে শুধু নাম না জানা অজস্র পাখির ডাক। চা খেয়ে গ্রামটা একটু ঘুরে নিলাম। ক্ষেত ভর্তি সব্জি। কোথাও রাসায়নিক সারের ব্যবহার নেই। প্লাস্টিকহীন, দূষণহীন আদর্শ গ্রাম। পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
যোগেশ ভাই গোর্খে থেকে বিদায় নিল। ওর গ্রামে কাল ফুটবল টুর্নামেন্ট। মন খারাপ হয়ে গেল। এই ক'দিনে আমরা একটা পরিবার হয়ে উঠেছিলাম।
স্নান করে, আলু পরোটা দিয়ে সকালে জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। আজ সারাদিনের তেমন কোনও লক্ষ্য নেই। ভবঘুরের জীবন। গোর্খে থেকে সামানদিনের দূরত্ব খুব কম। দুই কিলোমিটারের আশেপাশে। গোর্খে থেকে রাম্মাম যাওয়ার রাস্তায় চললাম। আকাশছোঁয়া পাইন বনের জঙ্গল, সূর্যের আলো প্রবেশের অধিকার রহিত। কাঠের লগবাঁধানো মাটির রাস্তা, কোথাও বা সিমেন্টের। বাঁক ঘুরে একফালি খোলা জায়গা। হাত-পা ছড়িয়ে গড়িয়ে নিলাম সবাই। পায়ে পায়ে হাজির সোনালি পশমের বলের মতো সারমেয়। গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল পাপাইয়ে গা ঘেঁষে। হাবভাবে যেন বহুদিনের পরিচিত। আমরা উঠে দাঁড়াতে, গা ঝাড়া দিয়ে তিনিও চললেন সঙ্গে। বলা ভালো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সামানদিনের দিকে।

প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেলাম সামানদিনের। এরকমও হয়!!! এত মোহময়। গহীন পাইন জঙ্গলের মধ্যে দ্বীপের মতো একটুকরো জনপদ। সাকুল্য কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বসবাস। ঝকঝকে তকতকে। কয়েকটা মাত্র হোমস্টে। সামানদিন ছুঁয়ে রাস্তা নেমে গেছে রাম্মামের দিকে। ঢুকতেই গ্রামের এক দিদি জিজ্ঞেস করলেন চা-কফি কিছু লাগবে কিনা। এখানে সেই অর্থে কোনো দোকান নেই। কফি খেতে খেতে দিদির কাছে দুপুরে লাঞ্চের কথাও বলে দেওয়া হল। দেশি মুরগির ঝোল আর ভাত। সামনেই একটা ফুটবল মাঠ। দিদিকে বলতে ফুটবলও জোগাড় হয়ে গেল। দুই দলে ভাগ হয়ে, মিনি গোলপোস্ট করে খেলা হবে। আমার আর শুভর ইচ্ছে করছিল না। মাঠের পাশের বেঞ্চে আয়েশ করে বসলাম। হাবেভাবে যেন বিরাট মাপের দুই কোচ। মোরিনহো বনাম গুয়ার্দিওলা। এই অবধি ঠিকই ছিল কিন্তু বাঙালি ছেলে মাঠের ফুটবল ছেড়ে বসে থাকবে সেটা ভাবাটা একটু কষ্টকর। তাই ইতিহাসের পাতায় নাম তুলতে দুই কোচও ফুটবল পায়ে সম্মুখ সমরে নেমে পড়ল।

আমরা জিতলাম ৩-১ গোলে। হিমালয়ের বুকে সেই অবিস্মরণীয় ম্যাচের পর দেশি মুরগির ঝোল আর ভাত... যেন অমৃত। লাঞ্চের পর আরও কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে ফেরার পথ ধরলাম। সোনালী পশমের সেই চতুষ্পদী বন্ধু আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল গোর্খের একটু আগে পর্যন্ত। যেখানে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল।

২০ ডিসেম্বর, ২০২০ (গোর্খে থেকে ভারেং):
#ইয়ে গলতি ভারি পড় সকতা থা...

গোর্খে ছেড়ে আসার সময় সবারই মনখারাপ। সঙ্গে যোগেশ ভাই নেই। তাই গোর্খে থেকে ভারেং-এর রাস্তা জেনে নিয়ে চলতে শুরু করলাম। পুরো গ্রামটা এক পাক দিয়ে নদীর দিকে নেমে গেলাম। ব্রিজ টপকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিমে। পায়েচলা মাটির রাস্তা জঙ্গলের দিকে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। নীল আকাশের নিচে গোর্খে গ্রাম যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। ঝিঁঝিঁডাকা গহীন বন দিনের বেলায়ও বেশ গা ছমছমে। রাস্তা বেশ সহজ সরল, অহেতুক চড়াই উতরাইয়ে পথিককে বিপদে ফেলার কোনও অভিপ্রায়ে নেই। জঙ্গল ক্রমশ গভীর হচ্ছে। রাস্তা হারালেই বিপদ। কোনো শর্টকাট নেওয়ার চেষ্টা করিনি। পায়েচলা পথ মাঝে মধ্যেই শুকনো পাতায় ঢাকা পড়েছে। জঙ্গলের একধারে একটু বেশি আকাশ দেখা যাচ্ছে... একটা পাতা ঢাকা কুটির। কথা বলে জানা গেল আমরা ঠিক রাস্তায় এসেছি। আর কিছুটা গেলেই ভারেং।
ভারেং গ্রামের প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। কয়েকজন বয়ঃবৃদ্ধ দুপুরের রোদের উষ্ণতায় আড্ডায় মশগুল। জিজ্ঞেস করলাম 'দোর্জি শেরপার' ফেনেশা হোমস্টের রাস্তা। রাস্তা বলে দিয়ে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আপ লোগো কা গাইড কিধার হ্যায়?"
নেই, শুনে ঘাড় নেড়ে বললেন, "ইয়ে গলতি ভারি পড় সকতা থা। গয়ে সাল দো তিন লোগ ভটক গ্যয়ে থে জঙ্গল মে। তিন দিন বাদ মিলে...।" সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা একদল ছেলের জন্য এই উৎকণ্ঠা দেখতে হয়ত আমরা অভ্যস্ত নই। মন ছুঁয়ে গেল। মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে চললাম।
ফেনেশা হোমস্টের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে এক খুদে। বছর দু-তিন হবে হয়তো। অবাক চোখে দেখছে আমাদের। লাঞ্চের সময় গুটি গুটি পায়ে এসে হাজির। চকোলেট ঘুষ দিয়ে বন্ধুত্ব পাতালাম। কোলে বসে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করল। নাম বলল, 'খুংশুক ডোমা শেরপা'। দেখতে দেখতে বন্ধুত্ব একটু গাঢ় হল। হাসি খেলায় মেতে উঠলাম সবাই। কখনো বিড়াল কোলে বিছানায়, কখনও খড়ের গাদায় গড়াগড়ি...। তার বন্ধুরা এসে ডেকে ডেকে ফিরে গেল। আজ সে নতুন বন্ধু পেয়েছে। রাত বাড়লে অনেক কষ্টে খুংশুককে তার মায়ের জিম্মায় দিয়ে এলাম।

২১ ডিসেম্বর, ২০২০ (ভারেং থেকে নিউ জলপাইগুড়ি):
#Do widzenia

ঘুম ভাঙার পরও বিছানা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছা করছিল না। বিল্টুদা যথারীতি মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে গেছে। আর আড্ডা যেন শেষই হতে চায় না। একটু পরেই বেরোতে হবে। আজ রাতে ফেরার ট্রেন। জানি না আবার কবে একসঙ্গে দেখা হবে...। লাগেজ গুছিয়ে একে একে স্নান করে তৈরি হয়ে নিলাম সবাই। আজ স্পেশাল ব্রাঞ্চ। বাবুকা'র পুরি তার সঙ্গে আলুর তরকারি। পুরিতে ছাতুর স্পেশাল স্টাফিং।
সাড়ে আটটা নাগাদ মায়ের হাত ধরে তিনি হাজির। খুংশুক ডোমা শেরপা। চাষের ক্ষেতে যাবার আগে তার মা তাকে মাসির কাছে রেখে যায়। আর মাসি হলেন আমাদের হোমস্টের দিদি। খুংশুক এসেই কোলে ঝাঁপিয়ে উঠল। কোলে পিঠে চড়ে নানান কসরত দেখিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল আমাদের। কখনও আমার ফোন নিয়ে সেলফি, কখনও বিড়াল ছানার ক্যান্ডিড...!
গাড়ি হাজির। রুকস্যাক গাড়ির মাথায় তুলে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তখনো কিছু বুঝতে পারছে না সে...। তার বন্ধুরা তাকে ফেলে চলে যাবে এটা সে ভাবতেই পারছে না! একে একে গাড়িতে উঠছি সবাই। মাসির হাত ছাড়িয়ে গাড়ির খুব কাছে চলে আসছে খুংশুক। "খুংশুক হট যাও...লাগ যায়েগি তুমহে..." ফরসা টুকটুকে গাল অভিমানে লাল হয়ে উঠেছে। দুটো মায়াবী চোখ জলে ভরা। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ঢালু পাহাড়ি রাস্তা ধরে গাড়ির পিছনে ছুটে আসছে খুংশুক। জানি ফিরে আসার মিথ্যা আশ্বাসে কোনও কাজ হবে না। গলার কাছে একটা দলাপাকানো কষ্ট। গাড়ির রিয়ার ভিউ ফাইন্ডারে, চশমার কাচে ক্রমশ ঝাপসা হচ্ছে খুংশুক... দূরত্ব, কুয়াশা না কী অন্য কিছু ঠিক বুঝতে পারলাম না...

~ সান্দাকফু ট্রেক রুটম্যাপ || সান্দাকফু ট্রেকের আরও ছবি ~

পেশায় জিওলজিস্ট সুদীপ্ত ঘোষ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে জীববিদ্যার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, বর্তমানে ভারত সরকারের 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার' জয়পুর অফিসে কর্মরত । কাজের জন্য বছরে ছয় মাস কাটে পাহাড়ে, জঙ্গলে। ফিল্ডে অবসর কাটে বই পড়ে, ক্রাইম থ্রিলার আর ভ্রমণকাহিনি বিশেষ পছন্দ। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখাও পছন্দের তালিকায় নতুন সংযোজন। ভালো লাগে ঘুরে বেড়াতে। পাহাড় আর জঙ্গল দুইই বিশেষ প্রিয়। এছাড়া বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া অন্যতম পছন্দের কাজ। লেখালেখির হাতেখড়ি 'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল পত্রিকায়।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেত্রবতী নদীতীরে উপেক্ষিতা ওরছা

পৃষতী রায়চৌধুরী

একটি পাখিকে দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখার পর হঠাৎ একদিন খাঁচার দরজা খুলে বার করে দিলে সে যেমন উড়তে গিয়ে হোঁচট খাবে, ঠোক্কর খাবে, তার আঁধার-সওয়া, আলোয় অনভ্যস্ত চোখ যেমন খোলা আকাশের ঝকঝকে রোদ্দুরে ধাঁধিয়ে যাবে, গাড়িটা ক্যাম্পাসের গেট পেরিয়ে শহরের রাস্তায় পড়া মাত্র ঠিক সেই অনুভূতিই হল আমার। ২০২০-এর মার্চ থেকে মার্চ, ২০২১ - বন্দীদশার বর্ষপূর্তি। ক্যাম্পাসের লক্ষণরেখা পেরোইনি গুণে গুণে বারোটি মাস। চার দেওয়ালের মধ্যে নিরন্তর ঠোক্কর খেতে খেতে হাঁপিয়ে ওঠার পর আজ যেন তাই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত'। আদেখলার মত হাঁ করে তাকিয়ে দেখি রাস্তার দুধারে বয়ে চলা জীবনপ্রবাহ। যেন জন্মে দেখিনি এমন মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকি ঠেলাগাড়িতে স্তূপ করে বিক্রি হতে থাকা চিকন-সবুজ শসা-কাঁকরি, নানাপ্রকার নমকিন আর পাঁপড়ের সম্ভার, সাদা পুরুষ্টু ফোলা ফোলা মাখানার স্তূপ, সিমেন্টের বস্তাঠাসা গুদামঘর, স্টিল রঙের গোডাউন, টাইলস আর মার্বেলের দোকান, থরে থরে সাজানো আসন্ন গ্রীষ্মের মোকাবিলায় তৈরি কুলারের বাক্স। দেখি রকমারি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং – অমুক কোচিং সেন্টার থেকে কতজন জয়েন্ট এন্ট্রান্সে পেয়েছে, তমুক ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্ডেন স্কুলটি স্বর্গের কতটা কাছাকাছি, তমুক সুপার-স্পেশালিটি হসপিটালে কত যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করাবে ইত্যাদি। দেখেশুনে মনে হল শিক্ষা আর স্বাস্থ্যই শেষ অবধি সবচেয়ে বড় কমোডিটি। রাস্তার এপাশে লাল-হলুদ শাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে প্যান্টশার্ট পরিহিত এক টিকিধারী হাপুসহুপুস ফুচকা খাচ্ছেন, অন্যদিকে নির্বিকারে জাবর কেটে চলেছেন খুঁটিবাঁধা এক গোমাতা। বহুদিনের অদর্শনে চারপাশের তুচ্ছ গতানুগতিক দৃশ্যরাও আজ আমার কাছে মূল্যবান। তৃষিতের মত এইসব দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ চাখতে চাখতে একসময় হাইওয়েতে উঠি। ধীরেধীরে শহরের সীমানা পেরিয়ে যাই। বাড়িঘর, দোকানপাট বিদায় নিয়ে এখন রাস্তার দুধারে চৈত্রের খাঁ খাঁ মাঠ। বেশিরভাগ ক্ষেতই শুখা, ফসল তোলার পর ধূধূ পড়ে আছে। কোথাও কোথাও গেঁহু, বাজরা আর সূর্যমুখীর চাষ হয়েছে। মাঝেমাঝে বাবলার জঙ্গল।

শুক্রবারের বিকেল। তাড়াতাড়ি বেরোনোর শত চেষ্টা করেও ঠিক সেই সাড়ে চারটে বেজেই গেল। কাল্পি শহরে ঢোকার মুখে যমুনা নদীর সেতুতে উঠলাম তখন যমুনার জলে অস্তগামী সূর্যের ছায়া। কানপুর-ঝাঁসি হাইওয়ে ধরে চলেছি এখন। গন্তব্য কানপুর থেকে আড়াইশো কিলোমিটার দূরের এক ছোট্ট জনপদ – ওরছা। ভারতবর্ষের হাই-প্রোফাইল ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনের তালিকায় ওরছার নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে না আছে কোনো মনোহর সমুদ্র সৈকত, সফেন জলরাশি, না আছে সুউচ্চ কোনো পর্বতমালা, নেই কোনারক বা খাজুরাহোর মত কিন্নর-কিন্নরীশোভিত তেমন কোনো মন্দির, বা তাজমহলতুল্য কোনো বিস্ময়কর শ্বেতশুভ্র মার্বেলের স্থাপত্য, অথবা বান্ধবগড়ের মত শার্দূল-বিচরিত অরণ্য। তাহলে কী আছে এখানে? কেন কিছু মানুষ তবু আসে? কে জানে, হয়তো তারা আসে বিস্মৃত ইতিহাসের হৃদস্পন্দন শুনতে। চারশো-পাঁচশো বছরের পলিমাটি সরিয়ে তার নিচে চাপা পড়ে থাকা অতীতের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জয়-পরাজয়, গৌরবগাথার কাহিনিতে ডুব দিতে। বুন্দেলখন্ডের এই রুক্ষ পাথুরে মাটিতে, পাতাঝরা শালবনে, রাঙা আগুনজ্বালানো পলাশ-শিমূলের জঙ্গলে,বেত্রবতীর কুলুকুলু জলস্রোতে, শতাব্দী-প্রাচীন কেল্লায়, পাথরের মন্দিরে আর ছত্রীর খাঁজে খাঁজে কান পাতলে শোনা যায় কতসব বিচিত্র কাহিনি, উপাখ্যান, লোককথা, উপকথা। অনুভূত হয় শত শত বছরের ইতিহাস আর যুগ যুগের কল্পনার মিশেলে তৈরি হওয়া আলোআঁধারির জাফরিকাটা রহস্যময়তা।

আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল কানপুর থেকে। ঝাঁসিকে ডাইনে রেখে যখন বাঁদিকের টিকমগড়- ঝাঁসি রোডে বাঁক নিলাম,তখন অদূরে ঝাঁসি শহরের আলোকমালা দেখা যাচ্ছে। এখানে উত্তরপ্রদেশকে বিদায় জানিয়ে মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ। একদা যা ছিল বুন্দেলখন্ড, এখন তা বিভক্ত উত্তরপ্রদেশ আর মধ্যপ্রদেশের মধ্যে।

ওরছা পৌঁছতে রাত সাড়ে আটটা বাজল। বেত্রবতীর তীরে মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজমের অতিথিনিবাস – বেতোয়া রিট্রিট। দুটি হেরিটেজ স্যুইট আর গোটাকুড়ি স্যুইস টেন্ট নিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বানানো অতিথিনিবাসটি। পাথরের খাঁজ কেটে কেটে ছোট ছোট চাতালে একেকটি তাঁবু, তাদের ঘিরে শাল-পলাশ-অমলতাস-জাকারান্ডা গাছেদের ভিড়। এমনই একটি তাঁবুতে আমাদের দু'রাতের আশ্রয়। রিসর্টের গা ঘেঁষেই বয়ে চলেছে বেত্রবতী নদী। স্থানীয় নাম – বেতোয়া। নদীর জলে তখন গাঢ় আঁধার ঘনিয়েছে। শুধু ছলাৎছলাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে জলরাশি জানান দিচ্ছে তার বিরামহীন বহমানতা।

মোটরসাইকেলসহ ইতস্তত দাঁড়িয়ে। এরা সব ওরছার ট্যুর গাইড। খানিক কথাবার্তার পর এদেরই একজনের ওপর আমাদের নগরপরিদর্শনের ভার ন্যস্ত হল। হেমন্ত সিং গাউর নাম্নী ওরছার সেই ভূমিপুত্রের সঙ্গে দুর্গপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। ইতিহাসের চাকা ধীরে ধীরে গড়াতে লাগল উল্টো দিকে। পিছিয়ে গেলাম পাঁচশত বছর সময়কাল।

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ। উত্তরভারতের রাজনীতিতে সদ্য ঘটে গেছে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। লোদি সুলতানবংশের হাত থেকে দিল্লির সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়েছেন তরুণ এক মুঘল বীর। তিনি নাকি মাতৃকুলের দিক দিয়ে দুর্ধর্ষ মঙ্গোলীয় যোদ্ধা চেঙ্গিস খানের এবং পিতৃকূলের দিক দিয়ে তুর্কি যোদ্ধা তৈমুর লঙ্গের উত্তরসূরী। দিল্লির সিংহাসন দখলের পরই উত্তর ও মধ্যভারতের অন্যান্য রাজ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তারে বিশেষ সচেষ্ট নতুন বাদশা। উত্তরভারতের এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় মধ্যভারতের বুন্দেলা বংশের রাজপুত রাজা রুদ্র প্রতাপ সিং মুঘল আগ্রাসন থেকে নিজের রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য তাঁর রাজধানী গড়কুণ্ডা থেকে সরিয়ে এনে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও কিছুটা দুর্গম কোনো জায়গায় স্থাপন করার পরিকল্পনা করছিলেন। একদিন শিকারে বেরিয়ে বেত্রবতী নদীর তীরে জঙ্গলে ঘেরা একটি পাথুরে সমতল জায়গা দেখে তাঁর মনে হল, রাজধানী স্থাপনের জন্য এ একেবারে উপযুক্ত স্থান। বুন্দেলখন্ডি ভাষায় 'ওরছা' শব্দের মানে হল লুক্কায়িত বা 'hidden'। চারদিকে উঁচু টিলা আর ঘনজঙ্গলে ঘেরা জায়গাটি খানিক সেরকম।

ওরছাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর প্রথমেই স্থানটিকে উঁচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করালেন রাজা রুদ্র প্রতাপ। অতঃপর শুরু হল কেল্লা তৈরির কাজ। কিন্তু কাজ শুরু হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই একদিন শিকারে গিয়ে এক শার্দূলের আক্রমণে আহত হলেন রাজা। দিনকয়েকের মধ্যে সেই ক্ষতস্থানে পচন হয়ে মৃত্যু হল তাঁর।

১৫৩১ সালে রুদ্রপ্রতাপের মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ভারতী চাঁদ বুন্দেলা। ইনি অসমাপ্ত কেল্লার নির্মাণকার্য সমাপ্ত করালেন। ফোর্টের আর্কিটেকচার হল রাজপুত ঘরানার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ঘরানার মিশেলে। ততদিনে মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্যশৈলী এদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। চতুষ্কোণ একটি বাঁধানো চাতাল ঘিরে সারি সারি খিলান আর গম্বুজের সমন্বয়ে তৈরি চতুর্তল প্রাসাদ।

সূক্ষ্ম পাথরের জালি-কাজের কারুকার্যখচিত ঝুলন্ত বারান্দা প্রাসাদের চারদিক ঘিরে। পিলারে, কার্ণিশে, দেওয়ালে সর্বত্র পাথরের সূক্ষ্ম কারুকাজ। আলো-বাতাস চলাচলের উপযুক্ত খোলা বাতায়ন, পাশাপাশি দুটি মহলের মাঝে উন্মুক্ত ছাদ, যাকে বলে ওপেন টেরেস, স্কাইলাইট-যুক্ত অলিন্দ – সমস্তই একাধারে বিজ্ঞানসম্মত ও দৃষ্টিনন্দন।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমস্থাপত্যের রীতি মেনে এখানে রাজদরবারও দুটি ভাগে বিভক্ত। দিওয়ান-ই-আম ও দিওয়ান-ই-খাস। আমজনতার জন্য সাধারণ দরবার আর বিশেষ অমাত্যদের সঙ্গে শলা-পরামর্শের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট মন্ত্রণাকক্ষ। আর রয়েছে ফ্রেসকো। দেওয়ালজোড়া, ছাদ-জোড়া উজ্জ্বল রঙিন সব ফ্রেসকো। কী নিপুণ সেইসব অঙ্কন! কী উজ্জ্বল তাদের রঙের বাহার! মনেই হয়না, চার-পাঁচশো বছর বয়স সেগুলোর। কিছু ছবি কালের প্রকোপে সামান্য রঙ হারালেও, বেশিরভাগ ছবিই এখনও উজ্জ্বল। ছবিগুলিতে বর্ণিত হয়েছে হিন্দু পুরাণের কাহিনি, রাধাকৃষ্ণের লীলা, রামায়ণের নানা ঘটনা। রয়েছে বিষ্ণুর দশাবতারের ছবিও। প্রতিটা অবতারকে স্পষ্টভাবে চেনা যায় ও গল্পগুলোও বোঝা যায়। শাক্য রাজপুত্র গৌতম বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার হিসেবে চিত্রিত। এছাড়াও কোনো কোনো কক্ষে রয়েছে রাজার শিকারের দৃশ্য, রাজসভার দৃশ্য, সুন্দরী রাজপুত রমণীর কেশসজ্জা ও প্রসাধনের চিত্র।

কেল্লার সীমানার বাইরে একটু দূরে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। ফোর্টের প্রায় প্রতিটা অংশ ও প্রতিটি ঘর থেকে মন্দিরটি দৃশ্যমান। হেমন্ত সিং গাউর সেই মন্দিরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল - ওহ্ যো মন্দির দেখ রাহে হ্যায় না আপলোগ, ওহ্ হ্যায় চতুর্ভুজ মন্দির। উসকে সাথ ভি বহত সারে কাহানি জুড়ে হুয়ে হ্যায়। কাহানির নামে আমরা যে যার মোবাইল, ছবি তোলা ইত্যাদি স্থগিত রেখে উৎকর্ণ হলাম। সিংজি বলতে শুরু করলেন -

১৫৫৪ সালে ভারতী চাঁদ বুন্দেলা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ওরছার সিংহাসনে বসলেন রুদ্রপ্রতাপের আরেক পুত্র মধুকর

করলেন। এদিকে তাঁর রানি গণেশ কুঁয়ারি আবার রামচন্দ্রের ভক্ত। এই নিয়ে রাজা-রানির মধ্যে বিরোধ শুরু হল। অবশেষে রানির ইচ্ছে মেনে নিয়ে রাজা রামচন্দ্রের জন্য এই চতুর্ভুজ মন্দির তৈরির কাজ শুরু করলেন। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর নামে এই মন্দিরের নাম। রাজা ও রানি হয়তো এই ভেবে সন্ধিতে এসেছিলেন যে হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী কৃষ্ণ ও রাম দুজনেই তো সেই বিষ্ণুরই অবতার, সুতরাং বিরোধে কাজ কী। যাহোক, মন্দিরের কাজ শুরু হবার পর মহারানি গণেশ কুঁয়ারি অযোধ্যা সফরে গেলেন রামচন্দ্রের একটি উপযুক্ত মূর্তি আনার জন্য। অযোধ্যা থেকে রামের মূর্তি নিয়ে ওরছা নগরীতে ফিরে রানি দেখলেন মন্দির তৈরির কাজ তখনও সামান্য বাকি আছে। ততদিন রামমূর্তিকে অস্থায়ীভাবে নিজের বাসভবন 'রানিমহল'-এই রেখে দিলেন। শেষে মন্দির সম্পূর্ণ হলে যখন রামের মূর্তিকে মন্দিরে স্থাপনের সময় হল, তখন নাকি সেই মূর্তিকে আর কেউ সেখান থেকে ওঠাতে পারে না। রানির স্মরণ হল তিনি একদা স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে রামচন্দ্রের মূর্তি প্রথম যেখানে স্থাপিত হবে, সেখানেই তাঁর মন্দির করতে হবে। যাহোক, এতে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াল, রানিমহল সেই থেকে হয়ে গেল জনসাধারণের জন্য অবারিত দ্বার 'রাম রাজা মন্দির' আর অনন্যসুন্দর স্থাপত্যের চতুর্ভুজ মন্দির বহুকাল বিগ্রহহীন হয়ে পড়ে রইল। পরে সেখানে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি স্থাপনা করে কৃষ্ণের পুজো শুরু হয়।

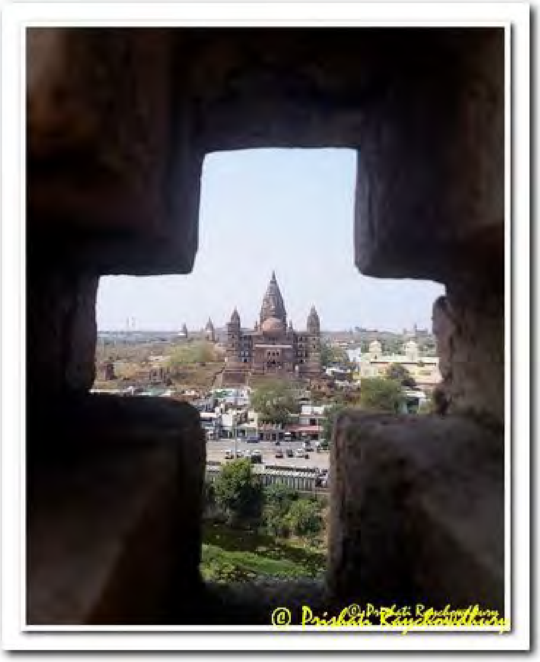

গল্প শোনার পর দ্বিগুণ উৎসাহে চতুর্ভুজ মন্দির ও রাম-রাজা মন্দিরের ছবি তুলতে লাগলাম। তবে দুটিতেই এখনও দুবেলা পুজো হয় এবং যথেষ্ট ভক্ত সমাগম হয় শোনার পর কোভিড ভাইরাসের সম্মান রক্ষার তাগিদে এযাত্রা আর মন্দিরচত্বরে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম না। কেল্লার নিরাপদ দূরত্ব থেকেই মন্দিরদর্শন করে আর ছবি তুলে সন্তুষ্ট থাকলাম।

এদিকে বুন্দেলাদের গল্প এগিয়ে চলল। মধুকর শাহের ছিল আট পুত্র। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর আট পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ হয়ে গেল। ওরছার রাজা হলেন বড় রাজপুত্র রাম শাহ বুন্দেলা। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে মনে রাখেনি। মনে রেখেছে মধুকর শাহের অন্য পুত্র বীর সিং দেওকে। বীর সিং দেও পেয়েছিলেন বড়ৌনির জায়গিরদারি, কিন্তু তিনি ছিলেন অসম্ভব উচ্চাকাঙ্খী, সাহসী আর দূরদর্শী। সামান্য ওই জায়গিরে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল সমগ্র বুন্দেলখন্ডের একছত্র অধিকার।
দিল্লির বাদশাহ্ আকবরের সঙ্গে সেসময় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিমের বিরোধ চলছে। পিতার বিরুদ্ধে একপ্রকার বিদ্রোহই ঘোষণা করেছেন সেলিম। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে সেলিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন বীর সিং দেও। ইলাহাবাদে গিয়ে দেখাও করে এলেন বিদ্রোহী যুবরাজের সঙ্গে। এইসময় বাদশাহ্ আকবর তাঁর একান্ত সুহৃদ আবুল ফজলকে পাঠালেন সেলিমের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার জন্য। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন আবুল ফজল ছিলেন একাধারে আইন-ই-আকবরি ও আকবর-নামার মত বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা, বীর যোদ্ধা এবং সম্রাটের প্রধান পরামর্শদাতা। কিন্তু বিচক্ষণ ও বীর হলেও আবুল ফজল সম্ভবত প্রস্তুত ছিলেন না পথিমধ্যে ওরছার রাজপুত রাজাদের কাছ থেকে কোনো অতর্কিত আক্রমণের জন্য। বীর সিং দেও বুন্দেলা তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করে পরাজিত করলেন, এবং হত্যাও করলেন। শুধু তাই নয়, আবুল ফজলের ছিন্নমস্তক লাল শালুতে মুড়ে রুপোর থালায় সাজিয়ে ভেট পাঠালেন এলাহাবাদে সেলিমের কাছে। ১৬০২ সাল সেটা। ক্রোধে দিশাহারা হয়ে গেলেন আকববর, তবু তাঁকে ক্রোধ সম্বরণ করতে হল, কারণ অপর দুই পুত্র মুরাদ ও দতিয়ান ততদিনে মৃত এবং তিনি নিজেও বৃদ্ধ হয়েছেন। সুতরাং মুঘলসাম্রাজ্যের স্থিতির জন্য রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যস্থতায় পিতাপুত্রের পুনর্মিলন সংঘটিত হল। বছর তিনেক পরে আকবরের মৃত্যু হলে যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে হিন্দুস্তানের মসনদে বসলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নিজের দুঃসময়ের বন্ধু বীর সিংহ দেওকে স্মরণ করলেন, পাঠালেন প্রচুর নজরানা এবং ওরছার রাজা হিসেবে তাঁর রাজতিলকের পরোয়ানা।

বীর সিং দেও-এর অতিথি হিসেবে ওরছাতে এলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর। তাঁর সম্মানে বীর সিং দেও বানালেন একটি মনোরম প্রাসাদ। ফিরোজা নীল ও সবুজ রঙের মিনে করা পাথরের কারুকাজ করা মিনার, গম্বুজ ও খিলানে শোভিত 'জাহাঙ্গীর মহল' নামের এই প্রাসাদটিও সপ্তদশ শতকের রাজপুত ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্যশৈলীর মিশেলের এক অপূর্ব নিদর্শন হয়ে ওরছা ফোর্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মিনের রঙগুলো যদিও এখন অনেক জায়গাতেই খসে গেছে, তবু কোনো কোনো খাঁজ থেকে বা কোনো খিলানের তলায় উঁকি মারে সেই নীল-সবুজের ঝলকানি।

বীর সিং দেও-এর আমলে বুন্দেলখন্ড রাজ্যের সীমানা অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ঝাঁসি, কাল্পি, মাহোবা, দাতিয়া, পান্না, সাগর, চিত্রকূট এই সমগ্র এলাকা নিয়ে ছিল বুন্দেলখন্ড রাজ্য। বলা হত, দক্ষিণে নর্মদা, উত্তরে তামস বা টনস, পশ্চিমে চম্বল আর পূর্বে যমুনা – এর মধ্যবর্তী পুরো অঞ্চল ছিল বুন্দেলখন্ডের অন্তর্গত। ঝাঁসি আর দতিয়ার কেল্লাও বীর সিং দেও-এর আমলেই তৈরি। কথিত যে, বৃদ্ধবয়সে বীর সিং দতিয়া থেকে ঝাঁসির কেল্লা দেখতে না পেয়ে বলেন, 'আঁখমে পুরা ঝাঁসি দিখাই যাতি'। অর্থাৎ সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। সেই থেকে ঝাঁসির ওই নামকরণ। পরে ঝাঁসি ও বুন্দেলখন্ডের অনেকখানি অংশ মারাঠাদের দখলে চলে যায় এবং কেল্লাটি রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গে ব্রিটিশ আর্মির যুদ্ধের পর একপ্রকার ধ্বংসই হয়ে যায়।

যাইহোক, ওরছাতে ফিরে আসি। জাহাঙ্গীরমহলের একটি অংশে এখন মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজমের হেরিটেজ হোটেল হয়েছে, নাম - 'শিশমহল'। ওরছার মূল ফোর্টটির প্রবেশদ্বার হিন্দুরীতি মেনে পুবমুখী, কিন্তু জাহাঙ্গীরমহলের প্রবেশদ্বার মুসলিমরীতির প্রতীক হয়ে পশ্চিমে। সেই পশ্চিমমুখী সিংহদুয়ারের বিশাল কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক দূর অবধি পলাশের লাল আগুনে রাঙা প্রান্তর দেখতে দেখতে আর চৈত্রের হু হু করা বাতাসের স্পর্শ নিতে নিতে যখন মনে মনে চলে গেছি সেই সপ্তদশ শতকে, তখন হেমন্ত সিং গাউরের কথায় চমক ভাঙল - ওপাশে ওই যে তিনতলা মহলটা দেখছেন, ওটারও একটা কাহানি আছে। তাই নাকি? শোনা যাক তাহলে। কাহানি শুনতেই না এখানে আসা!

ওই যে ওপাশে ত্রিতলা মহলটি, ওর নাম রাই পরভিন মহল। কে ছিল এই রাই পরভিন? কী তার কিসসা? সেই কথাই শোনাই এবার আপনাদের - হেমন্ত সিং বলে চলল। রাই পরভিন ছিল ওরছা রাজসভার এক রত্ন। অসাধারণ রূপসী সেই রমণী একাধারে প্রতিভাধর শায়ের, গায়িকা এবং নর্তকী। তার নামডাক ছড়িয়ে পড়েছিল ওরছা রাজ্যের বাইরেও। দেখতে দেখতে বাদশাহ্ আকবরের রাজসভাতেও পৌঁছে গেল রাই পরভিনের খ্যাতি। আকবর রাই পরভিনকে আগ্রায় আমন্ত্রণ জানালেন। ওরছাতে তখন রাম শাহের রাজত্বকাল। রাই পরভিন রাম শাহের ভাই ইন্দ্রজিত সিং-এর প্রেয়সী। তার জন্য ইন্দ্রজিৎ বানিয়ে দিয়েছেন রাই পরভিন মহল। ইন্দ্রজিৎ নিজেও নৃত্যগীতকুশলী গুণী। কিন্তু সম্রাটের আমন্ত্রণ তো আর উপেক্ষা করা যায় না। তাই নিরুপায় ইন্দ্রজিৎ রাই পরভিনকে আগ্রার দরবারে পাঠাতে বাধ্য হলেন। রাই পরভিনের নৃত্য-গীত-শায়েরীতে মুঘল রাজসভা মুগ্ধ। এমন রত্ন কেন ক্ষুদ্র রাজ্য ওরছায় পড়ে থাকবে, তোমার উপযুক্ত স্থান তো দিল্লিশ্বরের দরবারে। বাদশাহের এই আহ্বানের উত্তরে তাঁকে একখানি শায়রী শোনান রাই পরভিন।

ভিনতি রাই পরভিন কি,
শুনিয়ে শাহ্ সুজান,
জুঠি পাতর ভকত হ্যায়,
বারি বায়াস সেয়ান।

বাংলায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় খানিক এরকম – হে মহান বাদশা, রাই পরভিনের মিনতি শুনুন, অন্যের উচ্ছিষ্টের জন্য অভিলাষী যে জন, সে নিশ্চয় সারমেয়, বায়সপক্ষী, অথবা কোনো ভিখারী।
আকবর যা বোঝার বুঝলেন। কিন্তু তিনি গুণীর সমাদর করতে জানতেন, তাই রাই পরভিনের উপর তিনি ক্রুদ্ধ তো হলেনই না, বরং সামান্য এক নর্তকীর এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে প্রচুর উপঢৌকনসমেত সসম্মানে রাই পরভিনকে ওরছা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

কেল্লার আনাচে-কানাচে ঘুরতে ঘুরতে, গল্প শুনতে শুনতে আর ছবি তুলতে তুলতে ঘন্টাতিনেক কেটে গেছে। ঘড়িতে দুপুর দেড়টা। বাইরে আগুনের মত রোদ। আর কোথাও না যাই, লক্ষ্মী টেম্পলটা একবার দেখতেই হবে। সেখানে অসাধারণ কিছু ফ্রেসকো আছে তা জানি। তাছাড়া সেই মন্দির মূলশহরের বাইরে লোকালয় থেকে অনেকটা দূরে, তাই খুব ভিড় বা ভক্তসমাগমের ভয় সেখানে নেই।

কেল্লা থেকে তিন-চার কিলোমিটারের রাস্তা লক্ষ্মীমন্দির। গাড়িতে উঠলাম, আর আমাদের আগে আগে মোটরবাইকে পথ প্রদর্শক হেমন্ত সিং গাউর। মন্দির যাওয়ার পথে নদীর ধারের ছত্রীতে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। হেমন্ত সিং ঘুরে ঘুরে দেখাল রুদ্রপ্রতাপ থেকে শুরু করে মধুকর শাহ, ভারতী চাঁদ, বীর সিং দেও – সকল বুন্দেলা রাজা ও তাঁদের রানিদের ছত্রী। মোট পনেরোটি ছত্রী আছে এখানে। রাজপুত সংস্কৃতি অনুসারে রাজা-মহারাজাদের অন্ত্যেষ্টির পর বানানো স্মৃতিস্তম্ভকে বলে ছত্রী। পাঁচিলঘেরা রাজপরিবারের এই পুরনো ছত্রীগুলির অন্যপাশেই এখনকার শ্মশান - নাম 'মুক্তি ধাম'। কী সুন্দর নামখানি।

ছত্রী থেকে বেরিয়ে সোজা লক্ষ্মী টেম্পল। মিনিট দশেক লাগল। একটা উঁচু টিলার ওপরে বিশাল মন্দিরটি। এখান থেকে পুরো ওরছা শহরের যাকে বলে ৩৬০ ডিগ্রি প্যানারোমিক ভিউ পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা, তাই মন্দিরের চালাটি যেন একটি লক্ষ্মী প্যাঁচার ডানা মুড়ে থাকা মূর্তি। অবশ্য, হেমন্ত সিংজি না দেখালে এটা আমাদের কোনোমতেই চোখে পড়ত না। এটিও বীর সিং দেও-এর আমলেই তৈরি, অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে। অথচ এই মন্দিরের অলিন্দে,দালানে যেসব ফ্রেসকো রয়েছে, তাতে ইউরোপিয়ানদের ছবি এল কিভাবে? সিংজীর উত্তর তৈরি – মন্দির সপ্তদশ শতকে নির্মিত হলেও ফ্রেসকো আঁকা হয়েছে পরের দুশো বছর সময়কাল জুড়ে। ফ্রেসকো আঁকা খুবই সময়সাপেক্ষ কাজ, দু-একদিনে তা হয় না। তাই দেওয়ালচিত্রে যেমন চিরায়ত পুরাণ-কাহিনি আছে,তেমনি সমকালীন চিত্রও আছে।

আর সমকালীন মানেই তো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনশীল। তাই দেওয়ালে সীতার বনবাস, দশগ্রীব রাবণের সঙ্গে বানরসেনা সমেত রামচন্দ্রের যুদ্ধ, নন্দলালার মাখনচুরি বা বিষ্ণুর অবতারদের পাশাপাশি বুন্দেলখন্ডি কুস্তিগীরদের মল্লযুদ্ধ, রাজপুত রমণীর কেশসজ্জা, রাজসভায় নর্তকীর নৃত্য, রাজাদের শিকারক্রীড়া, আবার অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে মধ্যভারত জুড়ে ছড়িয়ে পরা সাহেব সৈন্যদের বন্দুক হাতে মার্চ করা, কামান নিয়ে যুদ্ধ, টেবিলের দুদিকে বসে দুই গোরা সাহেবের আঙুরলতাসহ মদ্যপান – সবই স্থান পেয়েছে মন্দিরের দেওয়ালে।
মন্দিরের বাকি সবকিছু ভাল লাগলেও হেমন্ত সিং-এর দেওয়া একটা তথ্য শুনে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। এই মন্দিরের কারুকার্য, ফ্রেসকো, দেওয়ালচিত্র সব টিঁকে গেলেও একটা জিনিস চলে গেছে। তা হল মন্দিরের অষ্টধাতুর তৈরি লক্ষ্মীমূর্তিটি। সে কী? কবে? না, মুঘলদের হাতে নয়, মারাঠা আক্রমণে নয়, এমনকি ব্রিটিশ আমলেও নয়। এই তো, মাত্র চল্লিশ বছর আগে এবং সেই চুরির কোনো কিনারাও হয়নি। মূর্তিও উদ্ধার হয়নি। কে জানে বিদেশের কোন বিলিওনিয়ারের ব্যক্তিগত মিউজিয়ামে শোভা পাচ্ছে সেই অমূল্য বিগ্রহ।

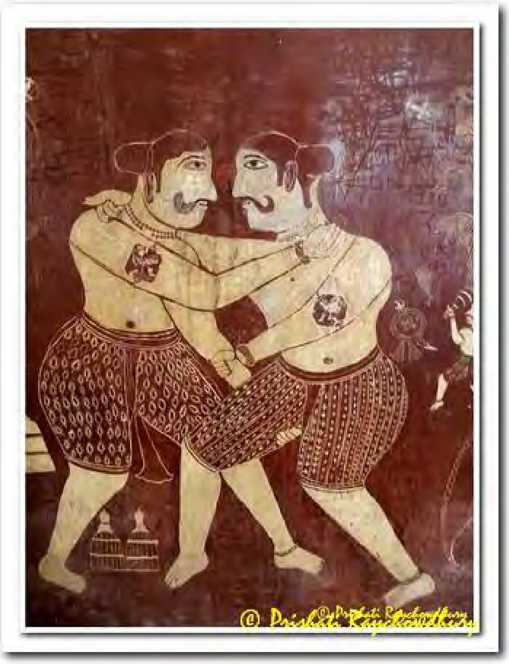

ধন্যবাদ ও বিদায় জানিয়ে ফিরে চললাম বেতোয়া রিট্রিটে। আর নয়। রোদ পড়ার আগে পর্যন্ত অন্তত রিট্রিট করে বেতোয়া রিট্রিটেই থাকতে হবে।
ত্রয়োদশী কন্যা ইতিহাসের গল্পে খানিক উৎসাহ পেলেও পৌনে দশের পুত্রের মুখটা ভার হয়ে আছে। এটা কেমন হলিডে? খালি ভাঙা কেল্লায় ঘুরে ঘুরে রাজা-মহারাজাদের গল্প শুনে যাও। কী বোরিং! তবে তুমি কী চাও বৎস? জানা গেল, তার ইচ্ছে বেতোয়া নদীতে স্নান করা, সাঁতার কাটা, রিভার-র‍্যাফটিং, কিছু না হলে নিদেনপক্ষে নদীর জলে বোটিং। অগত্যা রোদ পড়লে বেরোই পরিবারের ক্ষুদ্রতম সদস্যের দাবি পূরণ করতে।

বেতোয়া রিট্রিট থেকে ছত্রীর ঘাট দশ মিনিটের হাঁটাপথ। হেঁটেই এলাম। কয়েকটা প্যাডেল বোট রয়েছে সেখানে। স্থানীয় মানুষ নদীতে নৌকোবিহার করছে, কেউ কেউ স্নানও করছে। একটা ছোট বোট নিয়ে আমরাও ভেসে পড়লাম নদীতে। বেতোয়ার জলে তখন গোধূলির আলো। নদীবক্ষ থেকে দূরের কেল্লা, ছত্রী, নদীতে তাদের প্রতিবিম্ব, নদীকে ছুঁয়ে অনুভব করা – অন্যরকম ভাল লাগায় ভরে গেল মনটা। ওরছাতে এর আগেও দুবার এসেছি, কিন্তু কোনোবারই বেত্রবতীর বক্ষে নৌকোবিহার কিংবা নদীর জল ছুঁয়ে দেখা এসব হয়নি। ভাগ্যিস ছেলেটা জেদ ধরেছিল। ভাবতে গিয়েই মনে পড়ল দশ বছর আগে এখানে প্রথমবার আসার দিনটির কথা। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির এই ত্রয়োদশী তো সেদিন আড়াই বছরের আড়াই ফুটিয়া, আর পৌনে দশের বালক তখন সবে অঙ্কুরিত, পৃথিবীর আলো দেখতে তার তখনও মাস পাঁচেক দেরি আছে। কতটা সময় চলে গেছে মাঝখানে! ভাবতেই অবাক লাগে। কত জল বয়ে গেছে এই বেত্রবতী নদী দিয়ে গত এক দশকে। তারপরেই চোখ পড়ল ছত্রীগুলোর দিকে। হাসি পেল। দশ বছর সময়কে আমি অনেক সময় ভাবছি। তাও আবার এই শহরের বুকে বসে, যেখানে কিনা এই কেল্লা, ছত্রী, মন্দির সব শত শত বছরকে শরীরে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। চারশো পাঁচশো বছরের তুলনায় দশ বছর তো গণ্ডূষমাত্র, পল-অনুপলের তুল্য। সত্যি, রেফারেন্স ফ্রেম চেঞ্জ হয়ে গেলে সবকিছুই কেমন আপেক্ষিক হয়ে যায়।

বোটিং সেরে ঘড়িতে দেখি সন্ধে সাতটা। এবার ছুটি কেল্লার দিকে। সাড়ে সাতটায় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হবে। সাতটা কুড়ির মধ্যে টিকিট কেটে কেল্লার দরবারের সামনের লনে উপস্থিত হই। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় শুরু হল শো। আলো আর শব্দের সাহায্যে মূর্ত করে তোলা হল ঘুমন্ত অতীতকে। হে অতীত, কথা কও, কথা কও। সকালে হেমন্ত সিং-এর কাছে যা শুনেছিলুম, সেগুলো তো বটেই, তার বাইরেও আরো কিছু কাহিনি শোনা গেল এখানে। সেগুলোই বলি এবার।

শাহজাহানের শাসনকালে ওরছার রাজা ছিলেন ঝুঝর সিং। তাঁর ভাই লালা হরদৌল ছিলেন খুব বীর ও সাহসী। কোনো কারণে ঝুঝর সিং-এর মনে সন্দেহ হল রানি চম্পাবতীর সঙ্গে হরদৌলের অবৈধ সম্পর্ক আছে এবং তাঁরা দুজনে মিলে ঝুঝর সিংকে সিংহাসন থেকে সরানোর চক্রান্তে লিপ্ত। এই সন্দেহের বশে তিনি হরদৌলকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করলেন। অকালমৃত লালা হরদৌল কিন্তু বুন্দেলখন্ডবাসীর হৃদয়ে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। হরদৌলের মূর্তি এখনও পূজিত হয় বুন্দেলখন্ডের নানা স্থানে। বুন্দেলখন্ডের আর কোনো রাজা দেবতার সম্মান পাননি, কিন্তু হরদৌল রাজা না হয়েও তা পেয়েছেন। আজও বুন্দেলখন্ডের কন্যাদের বিয়েতে প্রথম নিমন্ত্রণ পত্রটি প্রেরিত হয় হরদৌলের উদ্দেশ্যে। সে যেন যুগ যুগ ধরে সকল বুন্দেলখন্ডি কন্যার প্রিয় ভ্রাতা। হরদৌলের শুভকামনা না পেলে বিবাহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না। বুন্দেলখন্ডের বিবাহগীতির বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে হরদৌলকে নিয়ে নানা গীতিকা।

আইয়ো আইয়ো মোরে ভাইয়া হরদৌল
তুমরে হি বল্ পে বিয়াহ্ হ্যায় রচো।
কন্যা বৈঠি জোরে হাথ,
আ গয়ি দুয়ারে পে বারাত
তুম বিন জিয়ারা ঘবরাত।
তুমসে লগি হমরি আশ
ভাইয়া করিও নহি নিরাশ
হৃদয় মে জগি হো বিসওয়াস।
তুমরে হি বল্ পে বিয়াহ্ হ্যায় রচো...

সময় বয়ে যায়। শাহজাহানের সময় থেকেই ওরছা মুঘলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করদ রাজ্য। ওরছার রাজারা মুঘল দরবারে বার্ষিক কর পাঠান। কিন্তু আওরঙ্গজেবের আমলে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। আওরঙ্গজেব নাকি তাঁর সেনাপতি রণদৌল্লা খাঁকে ওরছা পাঠিয়েছিলেন চতুর্ভুজ মন্দিরটিকে ভেঙে একটি মসজিদ গড়ার জন্য। রণদৌল্লা খাঁ ও তার সেনাদলকে দেখে এবং তাদের আসার কারণ জেনে রাজপুরীতে শোরগোল পড়ে গেল। কিন্তু মুঘল বাদশার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার মত বাহুবল তখন আর ওরছার রাজাদের নেই। সুতরাং চতুর্ভুজ মন্দিরের ধ্বংস আটকানোর কোনো উপায় নেই।

রণদৌল্লা। অবাক হয়ে দেখল সেই সুকুমার কিশোর হাতের এক ঝটকায় নিজের পাগড়ি খুলে ফেলেছে, আর সেই পাগড়ির বাঁধন খুলে বেরিয়ে এসেছে এক ঢাল কেশরাশি। পুরুষ নয়, এ যে রমণী এক ! এবং এই রমণী আর কেউ নয়, আওরঙ্গজেবের কন্যা স্বয়ং বদরুন্নেসা। কথিত যে, ওরছার রাজপুত্র ইন্দ্রমণির সঙ্গে আওরঙ্গজেবের কন্যা বদরুন্নেসার নাকি প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং সেদিন বদরুন্নেসার সাহসী প্রতিবাদের জন্যই চতুর্ভুজ মন্দিরের গায়ে আঁচড় লাগাতে পারেনি রণদৌল্লা খাঁ। মন্দিরটি আজও তাই টিঁকে আছে।

রুদ্রপ্রতাপের আরেক পৌত্র চম্পৎরাও, যিনি মাহোবার জায়গির পেয়েছিলেন, তাঁর পুত্র ছত্রসালের হাত ধরে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে বুন্দেলা বংশের রাজ্যসীমা ও গৌরব সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। ছত্রসালের ছত্রছায়ায় বুন্দেলখন্ডি কাব্য, গীতি, সাহিত্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। কিন্তু এই ছত্রসালই আবার শেষ বয়সে মুঘল সেনাপতি মহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের সঙ্গে মোকাবিলায় সুবিধে করতে না পেরে মারাঠাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মারাঠা বীর প্রথম বাজিরাও পেশোয়া। বাজিরাও-এর সাহায্যে নিজের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরে তুষ্ট ছত্রসাল মৃত্যুর আগে বাজিরাওকে বুন্দেলার অনেকখানি অংশের জায়গির দিয়ে যান। মধ্যভারতে মারাঠাদের প্রবেশের অন্যতম সূচনা এই ছত্রসালের হাত ধরেই। ছত্রসাল তাঁর মুসলিম উপপত্নীর গর্ভজাত রূপসী কন্যা মস্তানির সঙ্গে বাজিরাও-এর বিয়েও দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক বলিউডি ব্লকবাস্টারের কল্যাণে এই বাজিরাও-মস্তানির কাহিনি অবশ্য সকলেরই জানা।

১৭৮৫ সালে রাজা বিক্রমজিৎ সিং ওরছা রাজ্যের রাজধানী ওরছা শহর থেকে সরিয়ে টিকমগড়ে স্থানান্তরিত করলেন। ধীরে ধীরে ওরছার গৌরবের দিন শেষ হল। জমতে শুরু করল বিস্মৃতির পলি। রয়ে গেল শুধু ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী এই কেল্লা, এই জাহাঙ্গীর মহল, রাই পরভিন মহল, চতুর্ভুজ মন্দির, রাজারাম মন্দির আর ছত্রীগুলি। আর কেল্লার আনাচে-কানাচে পাক খেয়ে বেড়ানো অতীতের যত হাসি-কান্না-স্বপ্ন-অতৃপ্তি-হাহাকার।

লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের শেষে রিসর্টে ফেরার রাস্তায় চলতে চলতে একটা খটকাই মনে রয়ে যায়। এই যে রুদ্র প্রতাপ সিং এসে দেখলেন বেত্রবতীর তীরে জঙ্গলাকীর্ণ পাথুরে ভূমি, এই ভূমি কি একেবারে মনুষ্যশূন্য ছিল? তা কি হওয়া সম্ভব? বিন্ধ্যাচলের অরণ্যে যেমন অরণ্যাচারী মানুষ ছিল, তেমন এখানকার বনভূমিতে, নদীর ধারে কি ছিল না কোনো আদিম জনগোষ্ঠীর বাস? তাদের কী হল? কোথায় হারিয়ে গেল তারা? সেই কোল, ভিল, গোন্ড আর অন্যান্য উপজাতির মানুষেরা? নিজেদের অধিকার ছাড়তে ছাড়তে কোথায় গিয়ে পৌঁছল তারা শেষ অবধি? সকালে নিজের পরিচয় দেবার সময় আমাদের গাইড হেমন্ত সিং সগর্বে যোগ করেছিল – ম্যায় রাজপুত হুঁ। ঘোষণাটির মধ্যে জাত্যাভিমান আর অহংবোধ স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। আর এই শহরের কাহিনিতে সবই তো দেখি রাজপুত, মুঘল, আর মারাঠাদের কথা। তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈরিতা, যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, প্রেম, বিবাহ, সন্ধি – নানান সম্পর্কের উত্থান-পতনের সাইন কার্ভ। সেই কোণঠাসা মানুষগুলোর কথা তো কেউ বলে না। কী জানি, হয়তো সেই আদি জনগোষ্ঠীদের কথা জানতে গেলে সেই আদিম ভারতবর্ষের হৃদস্পন্দন শুনতে গেলে কান পাততে হবে আরো গভীরে। ক্যামেরা আর মোবাইল হাতে দুদিনের ঝটিকা সফরে এসে সেই স্পন্দন শোনা যাবে না। তার জন্য সাধনা দরকার। অন্যরকম সাধনা। সেই ধৈর্য এবং সময় কি আছে আমাদের মত শহুরে পল্লবগ্রাহীদের? উত্তর তো জানা। আর এও জানি, আজ এই প্রশ্ন মনের মধ্যে খচখচ করলেও কাল বাড়ি ফিরে গিয়ে ভুলে যাব প্রশ্নগুলো। রয়ে যাবে শুধু রাজপুত, মুঘল, মারাঠা আর ব্রিটিশদের লেখা ইতিহাসই। বাকি কথা ডুবে যাবে বেত্রবতীর জলে। সেই বিষাদ বুকে ধারণ করে বয়ে চলবে নদী। শত শত বছরের পট পরিবর্তনের নির্বিকার, নিরুত্তাপ সাক্ষী হয়ে। কল কল ধ্বনি জাগিয়ে তার শুধু অবিরাম বয়ে চলা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। নদীর জন্ম-

তথ্য ঋণ:

- *"Orchha State". The Imperial Gazetteer of India, Vol. 19. Oxford at Clarendon Press. 1909. pp. 241–247*
- *"Orchha Town". The Imperial Gazetteer of India, Vol. 19. Oxford at Clarendon Press. 1909. pp. 247–248*
- *ঝাঁসির রাণী – মহাশ্বেতা দেবী*
- *উইকিপিডিয়া*
- *ওরছা ফোর্টের সান্ধ্য লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'তে বর্ণিত এবং স্থানীয় ট্যুর গাইডদের কাছে শোনা নানা উপাখ্যান*

পৃষতী রায়চৌধুরীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে। বর্তমানে কর্মসূত্রে কানপুরনিবাসী। পেশা অধ্যাপনা। কলেজ ম্যাগাজিনের চৌহদ্দি পেরিয়ে লেখালিখির সূচনা বাংলালাইভ ওয়েবজিনের হাত ধরে। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে, বাংলালাইভের শারদীয় ই-পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস – 'প্রথম উড়াল', ২০০৭-০৮ সালে বাংলালাইভে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। পরবর্তীকালে 'দেশ' ও 'সানন্দা' পত্রিকায় একাধিক গল্প এবং ভ্রমণকাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। 'দ্বৈত' নামে একটি গল্পসংকলন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 'সৃষ্টিসুখ' প্রকাশনী থেকে।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

পুরী থেকে পশ্চিমে সতপদায়

তপন পাল

সতপদায় প্রথমবার গিয়েছিলাম ছিয়ানব্বই সালে। পুরী গিয়েছিলাম, একদিন স্বর্গদ্বার থেকে হোটেলে ফিরছি, দেখি মহোদধি প্যালসের সামনে একজন মাইক নিয়ে কিসব বলছে। বলছে ওড়িয়ায়,তবে ডলফিন শব্দটি বারদুয়েক শোনা গেল। কৌতূহলী হয়ে একটি হ্যান্ডবিল নিয়ে দেখা গেল তার এক পিঠে ওড়িয়ায়, আর অন্য পিঠে বাংলায় লেখা। এবার থেকে প্রতি বুধবার ও রবিবার উড়িষ্যা সরকারের উদ্যোগে একটি ছোট বাস সকাল আটটায় মহোদধি প্যালেসের সামনে থেকে ছেড়ে অলরনাথ মন্দির ও বলিহারিচণ্ডী মন্দির হয়ে আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে চিলিকাতীরের সতপদায় যাবে। তদবধি বাঙালি সতপদার নাম শোনেনি – সে তখন চিলিকাকে চিল্কা বলতো; আর ভাবতো বালুগাঁওই চিলিকার একতম অধিগম্যতা। সতপদা শুশুক (Irrawaddy dolphin; orcaella brevirostris) এর জন্য খ্যাত। যাত্রীরা সেখানকার পান্থনিবাসে মধ্যাহ্নভোজ সারতে পারবেন, নৌকা ভাড়া নিয়ে শুশুক দেখতে পারবেন – চারটের সময় বাস সতপদা ছেড়ে বিকালে পুরী ফিরে আসবে। আমরা তক্ষুনি গিয়ে নাম লেখালাম,এবং ঘুরেও এলাম।

সেবারে একটি ভারি মজার ঘটনা ঘটেছিল। সতপদার এক রিকশাচালকের হাতে ছিল একটি কচ্ছপের ছানা (Indian Roofed Turtle; pangshura tecta)। পুত্র সেটি দেখে নাছোড়; ওটিকে সে বাড়ি নিয়ে যাবেই। রিকশাদাদারও কচ্ছপের ছানা দিতে আপত্তি নেই, বরং উৎসাহই আছে। বন্যপ্রাণ আইন তদবধি জনমানসে খুব একটা দাগ কাটেনি। কিন্তু আমার বিপদ ষোল আনা। রেলগাড়িতে তাকে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে,বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে কিভাবে রাখা হবে,মহানদী অববাহিকার এই বাসিন্দা পুরসভার কলের জলে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন কি না – ইত্যাকার উদ্বেগে আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। অবশেষে রফা হল, আমরা বাড়ি গিয়ে চানঘরে মাটি আর বালি দিয়ে একটা দ্বীপ বানাবো, সেখানে কিছু জলজ গুল্ম লাগিয়ে দেব; তারপর ফের সতপদা এসে তাকে নিয়ে যাব। ততদিনে সেও একটু বড় হয়ে যাবে। ছাব্বিশ বছর কেটে গেছে। সেই কূর্মশাবককে আর নিয়ে আসা হয়নি। জানি না এই ছাব্বিশ বছরে ভগবান বিষ্ণুর সেই দ্বিতীয় অবতার কত বড় হয়েছেন!

তখন পুত্র ছিলেন দশ। এখন পৌত্রী ছয়। তার পিতা শুশুক দেখে থাকলে তিনিই বা দেখবেন না কেন? অতএব আমরা সতপদায়। পুরী থেকে একটি গাড়ি ভাড়া করে প্রাতরাশান্তে বেরিয়ে অলরনাথ মন্দির ও বলিহারিচণ্ডী মন্দির হয়ে সতপদায়।

অলরনাথ মূলত বিষ্ণুমন্দির। সত্যযুগে, বলা নেই কওয়া নেই, মহর্ষি ব্রহ্মা এখানকার পাহাড়ের উপরে বিষ্ণুর স্তবস্তুতি শুরু করে দেন। বিষ্ণু,ওই আর কী,বার খেয়ে...; মহর্ষি ব্রহ্মাকে পাহাড়চূড়ায় গরুড়সহ বিষ্ণুমূর্তি স্থাপনের অনুমতি দেন; এই বিষ্ণুমূর্তিই অলরনাথ। মহর্ষি ব্রহ্মা এই পাহাড়ে বিষ্ণুকে তুষ্ট করেছিলেন বলে পাহাড়ের নাম হয় ব্রহ্মগিরি। রাজস্থানের আলোয়ারের রাজা সম্ভবত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; সেই সূত্রে বিষ্ণু এখানে আলোয়ারনাথ বা অলরনাথ। প্রথাগত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, সঙ্গে গরুড় তো আছেনই, আর আছেন দুই কৃষ্ণজায়া, রুক্মিণী আর সত্যভামা। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পিছনের চন্দনসরোবরে চন্দনযাত্রা হয় বছরে একুশ দিন। স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন,তাঁর জ্বর আসে। রাজবৈদ্য তাঁর চিকিৎসা করেন। অসুস্থতার এই পর্যায়টি 'অনসর' নামে পরিচিত। এই সময় ভক্তেরা দেবতার দর্শন পান না। তাঁদের দর্শনের জন্য বিগ্রহের পরিবর্তে মূলমন্দিরে তিনটি পটচিত্র রাখা হয়। এই সময় ভক্তেরা ব্রহ্মগিরিতে অলরনাথ মন্দিরে আসেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, অনসর পর্যায়ে জগন্নাথ অলরনাথ রূপে অবস্থান করেন।

গল্প বলে অনসরকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভু জগন্নাথের দর্শন না পেয়ে আকুল হয়ে পড়েন। শ্রীজগন্নাথ তাঁকে জানান,অনসরকালে তিনি ব্রহ্মগিরির অলরনাথ মন্দিরে বিশ্রাম করেন। তদনুযায়ী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পান। বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামকালে তাঁর করুণায় শিলা বিগলিত হয়, হয়ে দেহচ্ছাপ সেই শিলায় উৎকীর্ণ হয়ে যায়। পাণ্ডা মহারাজরা খুব গর্বের সঙ্গে সেই দেহচ্ছাপ দর্শনার্থীদের দেখান; দেখিয়ে দক্ষিণা দাবি করেন। এখানকার ক্ষীরভোগ সত্যিই দেবভোগ্য। পুরীর শ্রীমন্দিরে প্রভু জগন্নাথকে যা যা ভোগ দেওয়া হয়, অনসরকালে

পুরীর সাতাশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে, ভার্গবী নদীর মোহনায় একটি বালিপাথরের টিলার টঙে পূর্বমুখিন বলিহারিচণ্ডী বা হরচণ্ডী মন্দির। দেবী এখানে অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দিনী - নাবিক, নৌকা ও মৎসজীবীদের রক্ষয়িত্রী – সোনার বঁটির উপর উপবিষ্টা। মহানবমীর দিন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পূজা এই মন্দিরে পাঠানো হয়। দেবী নাকি রোজ রাত্রে ঘুরতে বেরোন। বালুকাময় ঢেউ খেলানো প্রান্তর, বড় বড় গাছ, লোকালয়হীনতা সেই বিশ্বাসকেই পরিপুষ্ট করে। কিছুটা দূরে কালীমন্দির, খুব কম লোকই সেখানে যান। মন্দিরের স্বল্পদূরত্বে একটি বালিয়াড়ি পেরিয়ে বলিহারিচণ্ডী সৈকত, নির্জন, কুমারী, জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। অত্যুৎসাহী যুবকবৃন্দ পুরীর মোহনা থেকে হেঁটে হেঁটে এখানে আসেন।

সেখান থেকে সতপদা। দিনটি চমৎকার। আকাশ সমুদ্রের মত নীল,তাপমাত্রা না গরম না ঠান্ডা – যদিও উত্তুরে হাওয়া মাঝে মাঝে জানান দিচ্ছে। ফিন এয়ারের হেলসিঙ্কি সেবু উড়ানটি উনত্রিশ হাজার ফুট উপরে চমৎকার দুটি সাদা রেখা টেনে গ্যাছে, তাইতে আকাশকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। বস্তুত, গন্তব্যে পৌঁছানোর চেয়ে চলতেই আমার বেশি ভাল লাগে, বিশেষত অদিশার রাস্তায়। এই সমুদ্র তো এই পাহাড়, এই ধানক্ষেত তো এই জঙ্গল, এই গ্রাম তো এই বাজার, এই রেলগাড়ি তো এই পাখির দল। পুরী, খোড়দা ও গঞ্জাম – ওড়িশার এই তিন জেলায় বিস্তৃত চিলিকার বিস্তৃতি ১১৬৫ বর্গ কিলোমিটার; এশিয়ার বৃহত্তম লোনাজলের হ্রদ (brackish water lagoon)। বঙ্গোপসাগরে চিলিকার যে মুখ, সতপদা তার খুব কাছেই। নৌকা যাচ্ছে রাজহংস দ্বীপে, চিলিকার মুখে, চার ঘন্টার দূরত্বে কালিজল মন্দির হয়ে নলবন পাখিরালয়ে। আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদের পর চিলিকা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পরিযায়ী পাখিদের আস্তানা। 'পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না। ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা'। আমাদের অত সাহস হয়নি,বিশেষত যখন পৌত্রী আছেন। বেড়াতে গিয়ে হঠকারিতা আমার বিলকুল না পসন্দ। নৌকাগুলি সবই যন্ত্রচালিত; তাদের শব্দ ও ঢেউ জলচরদের কাছে কতখানি বিরক্তিকর তা অনুমান করতে পারি। সেইজন্যেই মনে হয় প্রকৃতি পর্যটনের দরজা হাট করে সবাইয়ের জন্য খুলে দেওয়া আদৌ কাঙ্ক্ষিত নয়। যাদের এক্ষেত্রে উৎসাহ ও অবদান আছে, আছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুধাবন করার মত শিক্ষা – তাঁরাই শুধু যাবেন প্রকৃতি পর্যটনে। নচেৎ অন্যরা সঙ্গমের পক্ষীকুলকে ভুজিয়া খাওয়াবেন, সতপদার শুশুককে খোঁচা মারবেন, থাইল্যান্ডে বাঘের সঙ্গে আর কাজিরাঙ্গায় ময়াল (Indian rock python; python molurus)এর সঙ্গে ছবি তুলবেন।

নৌকাগুলি বেশ বড়, জনা পনেরো কুড়ি স্বচ্ছন্দে উঠতে পারে; তবু নিরাপত্তার জন্যে আমরা দুটি নৌকা নিলাম। একটিতে আমি পুত্র আর পৌত্রী, অন্যটিতে স্ত্রী ও পুত্রবধূ। মাঝিদাদাদের বলা হল যন্ত্র না চালিয়ে দাঁড় বাইতে, এবং কিছুটা যেতেই শুশুকের দেখা মিলল, প্রথমে দূরবীনে, তারপর খালিচোখে। পৌত্রী তো মহাখুশি পারলে দু-চারটে ধরে বাড়ি নিয়ে যায়।

মেকং-এও আমি শুশুক দেখেছি। পাকেচক্রে আমাকে কিছুদিন লবণ হ্রদের এক অফিসে চাকরি করতে হয়েছিল। অফিসটিতে কাজ কিছু ছিল না,কিন্তু রোজ গিয়ে গরমে বসে থাকতে হত। তখন অলস দ্বিপ্রহরে জানালা দিয়ে দূরে চেয়ে মনে পড়ত,১৮৫২র জুলাইয়ের বানে এক দঙ্গল ইরাবতী শুশুক ভেসে এসেছিল এই লবণ হ্রদে; হয়তো আমি আজ যেখানে বসে আছি সেইখানটিতেই। এডোয়ার্ড ব্লিথ, শিবপুরের কোম্পানির বাগানের তখনকার সুপারিন্টেনডেন্ট, খবর পেয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন; একটিকে ধরেও এনেছিলেন। তখনও অবধি শুশুককে মনে করা হত তিমির বাচ্চা; সে যে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি সেটিই জানা ছিল না। শুশুক দেখে প্রত্যাবর্তন; সারথি মহোদয় এখানকার পান্থনিবাসে জানিয়ে দিয়েছিলেন আমরা দুপুরে কী কী খেতে চাই। তদনুযায়ী কচ্ছপের মাপের কাঁকড়া ও হাঙরের মাপের পারশে মাছ অহল্যার মত আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাদের প্রতি সুবিচার করব, ফেরার পথে।

পথে একজায়গায় দেখলাম মেলা গোছের কিছু হচ্ছে, আর সেখানে তুমুল জোরে বাংলা রঙ্গবতী বাজছে। আশ্চর্য হলাম। জয়দেব থেকে বিদ্যাসাগর, সুভাষ থেকে চৈতন্য, রসগোল্লা থেকে পান্তা ভাত – মালিকানা স্বত্ব স্বামিত্ব নিয়ে বাংলা আর অদিশার মন কষাকষির শেষ নেই; তাইতে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে পদ্মশ্রী মিত্রভানু গাওতিয়া (১৯৪২ -) র লেখা এই সম্বলপুরি গানটি। প্রভুদত্ত প্রধান (১৯৪৩ – ২০১৮)-এর সুর দেওয়া গানটি নিয়ে অনেক অদিশি ভাইবোনেরই আক্ষেপ যে গানটি বাঙালি বাবুরা হাইজ্যাক করে নিল। চলচ্চিত্রটিতে এই গানটির দৃশ্যে জগন্নাথের পতাকা উল্টো টাঙানো হয়েছিল। তাই নিয়েও অদিশায় প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল। আর এখন এখানে বাংলা রঙ্গবতী বাজছে!

সন্ধ্যায় সমুদ্র; আর স্বর্গদ্বারের নৈশবাজার।

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূল ক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সে বিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালের বাংলায় ভ্রমণকাহিনি লেখালেখির প্রেরণা 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

গঙ্গোত্রী-গোমুখ – দেবভূমি হিমালয়

পারমিতা মুখোপাধ্যায়

জীবনের সবকিছুই অনিত্য। কেবল স্মৃতিই রয়ে যায় – সে সুখকর হোক বা বেদনাময়। মা চলে গিয়েছেন আজ প্রায় সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল। মাঝে মাঝে যখন একা হই; মায়ের কথা মনে পড়ে; কিংবা কেবল একা কেন? এমনিও মনে পড়ে অনেক সময় অথবা বলা যায় যে মায়ের কথা সব সময়েই মনে থাকে। মাঝেমধ্যে মনের পাল্লাটা খুলে যায় দমকা হাওয়ায় আর একরাশ দখিনা বাতাসের মত কত স্মৃতি ভিড় করে আসে। ভ্রমণের এক অদম্য 'প্যাশন' ছিল মায়ের। 'প্যাশন' বললাম এই কারণে যে, ভ্রমণ বিনে মায়ের জীবন ছিল অর্থহীন। বছরে একবার কী দুবার চেনা ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে পথে না নামতে পারলে মায়ের একটুও ভাল লাগত না। ভ্রমণের বই এবং পত্রপত্রিকাও ছিল অজস্র মায়ের সংগ্রহে। তেমনি একটি বই উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ অমনিবাস। মায়ের মৃত্যুর পর যখন মন ছিল শোককাতর অশান্ত সেই সময় উমাপ্রসাদের হিমালয় ভ্রমণের বর্ণনা এবং অভিজ্ঞতা মনকে অনেক শান্ত করেছিল। নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম হিমালয়ের গহন সৌন্দর্যে।

হিমালয়ে যে কবার গেছি তার সিংহভাগ পরিকল্পনাই ছিল মায়েরই করা। তারই অদম্য উৎসাহে পাড়ি জমিয়েছিলাম হিমালয়ের পথে পথে। কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী-গোমুখ, সিমলা-কুলু-মানালি, নৈনিতাল-আলমোড়া-রানিক্ষেত বা নেপাল অথবা দার্জিলিং।

আজ বড় লিখতে ইচ্ছে করছে গঙ্গোত্রী-গোমুখের যাত্রা নিয়ে। সে অনেকদিনই হল। প্রায় আড়াই দশক আগেকার কথা। অনেক কিছুই তুলে আনতে হবে স্মৃতি খনন করে। তা হোক, তবু লিখতে শুরু করলে দেখা যাবে গল্পের মতো স্তরে স্তরে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে কাহিনি বিন্যাস।

তখন সবে আমার বিএসসি পার্ট টু পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মায়ের অনেক দিনের ইচ্ছে গোমুখ দর্শনের। তার বছর পাঁচেক আগে কেদার-বদ্রী দর্শনের পর আর গাড়োয়াল হিমালয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। তাই গোমুখ দর্শনাভিলাষী আমরা তিনজন –বাবা, মা আর আমি হাওড়া থেকে পূর্বা এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম। মে মাস। দিল্লিতে তখন প্রচণ্ড গরম। নিউ দিল্লি স্টেশনে নেমেই তার তীব্রতা মালুম হল। থার্মোমিটারের পারদ ছুঁয়েছে সেদিন ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। দিল্লিতে রাত্রিবাস না করে সেদিনই বাসে চেপে চলে গেলাম হরিদ্বার -গাড়োয়াল হিমালয়ের প্রবেশদ্বার। যতটা এগিয়ে থাকা যায় আর কী! পৌঁছলাম যখন সূর্য গেছে অস্তাচলে। কিন্তু তখনও ক্ষীণ আভা ছড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে। মায়াময় হালকা কমলা রঙে ভরে আছে হরিদ্বার। হরিদ্বারে গঙ্গা কলনাদিনী – সবে নেমে এসেছে হিমালয়ের গিরিখাত ভেদ করে। গঙ্গার তীর ধরে অজস্র ধর্মশালা, দোকানপাট, হোটেল। উঠলাম ভোলাগিরি আশ্রমে। দুরাত্রি বাস এখানে। তারপরে তো গঙ্গোত্রীর পথে। কাজেই মোটামুটি একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেই যথেষ্ট। আশ্রমে সাদামাঠা ঘর, কমন স্নানঘর। চৌকির ওপর শোওয়ার জন্য কোনো গদি নেই। বাহুল্যবর্জিত, প্রায় সন্ন্যাসীর মতো। তা হোক, যে তীর্থপথে যাত্রা করেছি, সেখানে বাহুল্য বিড়ম্বনা বলেই মনে হয়। হিমালয়ের অপরূপ তুষারমৌলি রূপই এ পথের সম্পদ। আর কোনো সম্পদের প্রয়োজন নেই।
ভোলাগিরি আশ্রমে উঠলেও খাওয়াদাওয়া সারা হল দাদা বৌদির হোটেলেই। সেই আদি অকৃত্রিম দাদা বৌদির হোটেল যেখানে খাওয়া শুরুর আগে বাসমতী চালের সাদা ঝরঝরে ভাতে এক চামচে সুগন্ধি ঘি ঠিক পড়বেই!

ভোলাগিরি আশ্রমে বাঙালিদেরই ভিড়। একটি দলের সঙ্গে আলাপ হল। তারা চলেছে কেদার-বদরী। সেই দলে একটি মাঝবয়সী বউ এসেছে একলাই। এসে তো সে পড়েছে কিন্তু হরিদ্বার থেকেই তার চিন্তা শুরু। কেদার-বদরী ঠিকমত পৌঁছতে পারব তো? স্বামী ছেলেকে ছেড়ে একলাই এই দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে, এখন দুশ্চিন্তার অন্ত নেই! ভরসা দিই, চিন্তা করবেন না। নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবেন ঠিকমতই। জয় কেদার বলে এগিয়ে পড়ুন। বলি বটে কিন্তু চিন্তার ভূত তার মাথা থেকে যায় কই! আসলে বিদেশ-বিভুঁই; আত্মীয়স্বজন বিনা একাই এসেছে, তাই চিন্তা হয় বৈকি! বিপদে পড়লে তখন কে বা কার!

এগিয়ে চলা। জানি না, ভদ্রমহিলার কেদার-বদরী দর্শন হয়েছিল কিনা, পরে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি।

হরিদ্বার থেকে আমাদের গন্তব্য ছিল উত্তরকাশী। গঙ্গোত্রী গোমুখ যেতে হলে উত্তরকাশী দিয়েই যেতে হয়। পাহাড়ের উচ্চতা বেশি হওয়ায় সইয়ে সইয়ে যাওয়া উচিত। তা না হলে উচ্চতাজনিত কারণে শরীর খারাপ হতে পারে। তাই পরিকল্পনা ছিল উত্তরকাশীতে দুদিন রাত্রিবাস করে যাত্রা করব গঙ্গোত্রীর পথে।

হরিদ্বার থেকে প্রতিদিন সকালে উত্তরকাশীর বাস ছাড়ে। আগের দিন টিকিট বুকিং করে রাখা হয়েছিল। নির্ধারিত দিনে উত্তরকাশীর বাসে উঠে বসলাম। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ; সেখান থেকে হিমালয়ের চড়াই শুরু। বাস পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে শুরু করে। নিচু হয়ে কী একটা জিনিস খুঁজতে গেছি ব্যাগে, মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি জানালার দিকে মুখ করে বসি। জানালা দিয়ে তাজা হাওয়ায় ঝলক আসে। শরীরের আনচান ভাবটা কমে।

পথের দৃশ্য অপূর্ব। হিমালয়ের কোলে আসার এই তো পরম আনন্দ! পথের সৌন্দর্যকে প্রাণভরে দেখা। পাহাড়ের অবিশ্রাম ঢেউ; গিরিখাতে বয়ে চলা পাহাড়ি নদীর উচ্ছ্বাস আর সর্বোপরি গঙ্গার পাশ দিয়ে চলা – এ কি কম সৌভাগ্য!
উত্তরপ্রদেশ পরিবহন নিগমের বাসে চলেছিলাম। পথে একবার বাস খারাপও হয়ে গেল। কাজেই উত্তরকাশী পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বিকেল। হরিদ্বার থেকে উত্তরকাশীর দূরত্ব তো খুব কম নয়। প্রায় একশো সত্তর কী আশি কিলোমিটার।

উত্তরকাশীতে থাকার জায়গা মিলল হোটেল ভাণ্ডারীতে। এখন আর সে হোটেল আছে কিনা কে জানে। গঙ্গোত্রী যাওয়ার মূল প্রবেশদ্বার বলা চলে উত্তরকাশীকে। এর উচ্চতা ১১৫৮ মিটার। উত্তর ভারতের কাশী নামানুসারে এই জায়গার নাম উত্তরকাশী। কাশীর মতই এরও অবস্থান গঙ্গার তীরে। কাছাকাছি একটি পর্বতশিখরের নাম বরুণাবত। উত্তরকাশী শহরের মধ্যেও একটি শিবমন্দির আছে কাশী বিশ্বেশ্বর শিবের মন্দিরের মত। উত্তরকাশী এখন উত্তরাখণ্ড রাজ্যে পড়েছে এবং এটি উত্তরকাশী জেলার সদর শহর। আমাদের গঙ্গোত্রী তো বটেই, গোমুখ যাওয়ারও ইচ্ছা আছে। সুতরাং উত্তরকাশীতে যে দুদিন থাকব মনের মধ্যে গোমুখ যাওয়ার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার আকাঙ্খাতেই কাটবে। নিজেকে প্রস্তুত করা হিমালয়ের ক্রোড়ে সঁপে দেওয়ার জন্য।

পরদিন বিকেলের দিকে বেরোলাম শহরটা ঘুরে দেখতে। ভাগীরথীর উপরে ঝুলাপুল পার হয়ে ওপারে গেলাম। বাড়িঘরের দরজায় তালা লাগানো নেই দেখলাম। এখানে চুরি ডাকাতি হয় না।
পরদিন সকালবেলা গঙ্গোত্রীগামী বাসে চড়ে বসলাম। উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রী যাত্রাপথের দূরত্ব প্রায় সাতানব্বই কিলোমিটার। ভাটোয়ারি, গাংনানি, হরসিল হয়ে তারপর গঙ্গোত্রী। যাত্রাপথের সৌন্দর্য অতুলনীয়। মনে হয় পথের কষ্ট সার্থক হিমালয়ের এমন নয়ন মনোহর দৃশ্য অবলোকন করে। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ, কোথাও কোথাও আবার পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে রাস্তা চলে গেছে। ছবির মত সুন্দর হরসিল। গঙ্গা নেমে আসছে কলধ্বনি করে; হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায় হিমালয়ের উত্তুঙ্গ চূড়া। এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য হিমালয় ছাড়া আর কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না।

গঙ্গোত্রী পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। বাস থেকে নামতেই হিমেল হাওয়া ছুটে এল অভ্যর্থনা করতে। তুমুল বেগে বয়ে চলেছে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী।

থাকার জায়গা মিলল পাঞ্জাব সিন্ধ ধরমশালায়। পাহাড়ের গায়ে দোতলা কাঠের বাড়ি। দোতলায় আমাদের জন্য যে ঘরটি খুলে দেওয়া হল, সেটিতে কোন আসবাবপত্র নেই। কয়েকটি গদি পাতা রয়েছে কাঠের মেঝেতে। রাতে সেখানেই শোওয়ার ব্যবস্থা। সারাদিনের বাসযাত্রার ধকলে ক্লান্ত ছিলাম। সন্ধেবেলা কিছুটা নিচে নেমে ছোট একটা দোকানে রুটি সবজি খেয়ে

যেতে হবে পায়ে হেঁটে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। প্রথম ১৪ কিলোমিটার গিয়ে পৌঁছতে হবে ভুজবাসায়। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে আরো ৪ কিলোমিটার দূরে গোমুখ দর্শন করে সেদিনই নেমে আসতে হবে গঙ্গোত্রীতে।

রাতেই অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি ব্যাগে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। বিশেষ করে ওষুধপত্র, শুকনো খাবার, গরম জামাকাপড়। বোঝা বেশি বাড়ানো চলবে না কারণ পথ দুর্গম। মাল বওয়া বড়ো দুঃসাধ্য।
ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে প্রাত্যহিক কাজকর্ম সেরে সকাল আটটার সময়ই হাঁটা শুরু করলাম তিনজনে। সঙ্গে অবশ্য একজন গাইডও ছিল মালপত্র বওয়া এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। লোকজন মোটামুটি চলেছে – খুব বেশি যদিও নয়; তবু পথ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর পাহাড়ি রাস্তা এসব জায়গায় বিপদসঙ্কুলও। প্রত্যেকে হাতে একটা করে ছড়ি নিয়েছি। পাহাড়ি রাস্তায় ভর দিয়ে চলার জন্য এইসব ছড়ি বড় উপযোগী।

শুরু হল গোমুখের পথে চলা। জয় গঙ্গামাঈ কী জয়। পথ চলতে চলতে ক্রমশ প্রকাশ হয় নগাধিরাজের অপরূপ রূপ। আকাশ ঘন নীল। সেই নীলের গায়ে ঘুমিয়ে আছে বরফের সুউচ্চ পর্বত। সে যে কী সুন্দর না দেখলে কল্পনা করা যায় না। চড়াই বাড়াবাড়ি কিছু তখনও শুরু হয়নি। পাহাড়ের গা বেয়ে ঢেউখেলানো পথ এঁকেবেঁকে চলেছে। একদিকে গভীর খাদ। সেখান দিয়ে বয়ে চলেছে কলনাদিনী ভাগীরথী। মাঝে মাঝে দুটো একটা ছোটখাটো ঝরনা; তার ওপর দিয়ে ছোট কাঠের পুল। অনেকটা পথ পেরিয়ে হয়তো একটা ছোট্ট ছাউনি দেওয়া দোকান। চায়ের জল ফুটছে। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করতে এক কাপ চা বড়ো উপাদেয়। দোকানে দুদণ্ড বসলে পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য মনকে শান্ত করে তোলে।

গঙ্গোত্রী থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে চিরবাসা। চির মানে পাইন গাছ। এখানে পাইন গাছ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়, তাই এর নাম চিরবাসা। উচ্চতা ৩৩৫০ মিটার। চিরবাসায় বেশ কিছু দোকান রয়েছে। এগুলোকে 'চটি' বলা হয়। এরকমই একটি চটিতে সামান্য কিছু খাওয়াদাওয়া হল - রুটি, সবজি। হাঁটার সময় বেশি কিছু খাওয়াও যায় না। এখনও ভুজবাসা পৌঁছতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার বাকি। এই পাঁচ কিলোমিটার পথ বড় দুর্গম। কিছুটা হাঁটার পরেই পড়ল ঝুরঝুরে পাহাড়ি পথ। সবসময়ই নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়তে থাকে অঞ্চলটায়। প্রায় আধা কিলোমিটার রাস্তা খুব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে হয়। কোথাও কোথাও রাস্তার নিশানা তেমন নেই, পা রাখার জায়গা আছে মাত্র। পা ফসকালেই ভাগীরথীর অতলে তলিয়ে যেতে হবে। রাস্তা শুরু এবং শেষে সাইনবোর্ড লাগানো আছে বিপদসঙ্কুল পথ সম্বন্ধে সতর্ক করে। পথশেষে সাইনবোর্ডে 'ধন্যবাদ' শব্দটি দেখে ধড়ে প্রাণ আসে। কিন্তু সেইসঙ্গে আবার এও মনে হয় যে ফিরতে হবে এ পথেই!

যাই হোক, এগিয়ে চলেছি ভুজবাসার দিকে। ওখানেই আজ রাত্রিবাস। বেলা দুটো বেজে গিয়েছে। আবহাওয়াও খারাপ হয়ে আসছে। বেশ ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। অথচ সকালেও আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল। প্রায় বিকেল চারটে নাগাদ ভুজবাসা পৌঁছলাম। ভুজবাসায় থাকার জায়গা দুটি। একটি লালবাবার চটি আর একটি গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের কটেজ। সেই কটেজে একটা রুম পাওয়া গেল। বেশ ভাল। অমন দুর্গম জায়গায় এতো ভাল রুম, অ্যাটাচড টয়লেট পাওয়া যাবে কল্পনাই করিনি। রাতে আবহাওয়া কিন্তু বেশ খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টি শুরু হল। জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ছে এবার মালুম হচ্ছে। পরদিন আরও ৪ কিলোমিটার পথ হেঁটে গোমুখ দর্শন করে, কালকেই গঙ্গোত্রী নেমে যেতে হবে। আবহাওয়া তো খারাপ হয়ে গেল, দেখা যাক কাল কী হয়।
ঘুম ভাঙল ভোরবেলায়। বৃষ্টি নেই, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখি ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হয়েছে। ডাইনিং হলে চা ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে শুনলাম গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের কর্মচারীরা বলাবলি করছে, 'আভি সব নীচে উতার যাও। বরফ গিরনে লাগা। মৌসম অর খারাব হো যায়গা তো মুশকিল হোগা। রাস্তা বন্ধ হো যায়গা'।

খুব ঘাবড়ে গেলাম। মনটাও খারাপ হয়ে গেল। এতদূর এসে ফিরে যেতে হবে? এ যে তীরে এসে তরী ডোবা। কত কষ্ট করে আসা, এভাবে সব প্রচেষ্টা জলে যাবে? মায়ের মন এত খারাপ যে চায়ের গেলাসই উলটে গেল অসাবধানে হাত লেগে। সব চা গেল পড়ে। কর্মচারীরা অবশ্য বিরক্ত হল না। বলতে লাগল, কোই বাত নেহি। কোই বাত নেহি।

আর কী করা! ঘরে গিয়ে বিষণ্ন মন নিয়ে বসে আছি।
এতদূর এলাম; জাহ্নবী তোমার উৎসমুখ কি না দেখেই ফিরে যেতে হবে!
মনের ভেতর উথালপাথাল; কেমন যেন একটা কান্না দলা পাকিয়ে ওঠে গলার ভেতর...
হতাশা, ব্যর্থতা গ্রাস করতে থাকে ক্রমশঃ।
জানালার পর্দা সরাতে যাই ঘরে যাতে আলো আসে; হঠাৎ মনের মধ্যে আশার আলো ঝলকে ওঠে। আকাশটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে না?
হ্যাঁ, তাই তো!
আকাশে নীলের ছোঁয়া লেগেছে। পেঁজা তুলোর মত তুষারপাত আর নেই। অদূরে তুষারধবল শৈলচূড়া হাতছানি দিয়ে ডাকছে।
না, আর দেরি নয়। গঙ্গামায়ী মুখ তুলে চেয়েছেন। চলো, ভাগীরথীর উৎসমুখের উদ্দেশ্যে এখনি বেরিয়ে পড়া যাক।

গায়ে বর্ষাতি চড়িয়ে নিই। লাঠি হাতে নিয়ে টুকটুক করে এগোতে থাকি। ভাগীরথীর তীর ধরে পথ চলা। মাত্র ৪ কিলোমিটার দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গোমুখ-আকৃতি হিমবাহ – যার অন্তঃস্থল থেকে নির্গত হচ্ছেন পুণ্যসলিলা ভাগীরথী। এই ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনীর সম্মিলিত ধারা সৃষ্টি করবে পবিত্র গঙ্গা - মাতারূপে ঢেলে দেবেন তাঁর জলধারা আমাদের প্রাণসিঞ্চনে। নদী – সে তো মা-ই। নদীই জল; জলই জীবন। যে জীবন দান করে, মায়ের চেয়ে বড়ো আর কী অভিধানেই বা তাঁকে ভূষিত করা যায়?

দুচোখ সার্থক হয়। তবে বেশি দেরি করি না। আবার কখন আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাবে। নামতে শুরু করি। এইদিনই ফিরে যেতে হবে গঙ্গোত্রী। গোমুখের উচ্চতা ৪০২৩ মিটার আর গঙ্গোত্রী ৩৪১৫ মিটার। তখন বেলা প্রায় দশটা। ক্রমাগত একনাগাড়ে হেঁটে যখন গঙ্গোত্রী পৌঁছই, রাত প্রায় আটটা বাজে। ক্লান্ত শরীর কোনরকমে এলিয়ে দিই পাঞ্জাব সিন্ধ ধরমশালার কাঠের মেঝেতে।

বাইরে গঙ্গোত্রীর লোকালয়ে পাহাড়ের গায়ে ফুটে উঠছে বাতির আলো। গঙ্গোত্রী মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে। ঘন্টার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে।
সে এক অপূর্ব অনুভূতি!
জয় গঙ্গামায়ী কী জয়!!

ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি, গানবাজনা, ছবি আঁকার চর্চা করেছেন পারমিতা মুখোপাধ্যায়। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে নভি মুম্বইয়ে বসবাস প্রায় দেড় দশক ধরে। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৬ সাল অবধি আনন্দবাজার পত্রিকার 'মুম্বই' ক্রোড়পত্রে নিয়মিত লেখালেখি করেছেন। বর্তমানে যুক্ত রয়েছেন নভি মুম্বইয়ের একটি পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ প্রভৃতি সব রকমের লেখাতেই স্বচ্ছন্দ। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা নয়টি। এর মধ্যে দুটি ছোটগল্পের সংকলন, একটি উপন্যাস ও একটি জীবনীগ্রন্থ। 'দেশ', 'সানন্দা' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কনকচৌরির কার্তিক মন্দির

অরিন্দম পাত্র

কনকচৌরি (স্থানীয় উচ্চারণে কনকচোরি) নামটা বেশ সুন্দর, তাই না? নামটা আমার শোনা বেশ কিছুদিন ধরেই। অনেকদিনই ভেবেছি যাব, যাব। কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে এসেছি বার বার। কারণ? কারণ আর কিছুই না... ওই হাঁটার ভয়!
একটু বুঝিয়ে বলি। ভ্রমণ পত্র-পত্রিকা পড়ে বা ফেসবুকে ট্রাভেল গ্রুপ ঘেঁটে আপনারাও নিশ্চয়ই এতদিনে জেনে গেছেন যে এই কনকচৌরি গ্রাম থেকেই যেতে হয় কার্তিকস্বামী মন্দির। তাও আবার ৩ কিমি পায়ে হেঁটে। তবেই পৌঁছাতে পারবেন মহাদেব-পার্বতী পুত্র কার্তিকের মন্দিরে। হিমালয়ের বুকে কার্তিক ঠাকুরের ওই একটিই মন্দির। তাও আবার এত উঁচুতে! কিন্তু এত ঠাকুর আর দেবদেবী থাকতে শুধু কার্তিক ঠাকুরের মন্দিরে যাওয়ার এত উদগ্র ইচ্ছা কেন সবার? আসলে ওই মন্দিপ্রাঙ্গণ হল হিমালয়ের ব্যালকনি। মন্দিরের ঠিক পেছনেই ১৮০ ডিগ্রি জুড়ে শুধু হিমালয় আর হিমালয়। তার সঙ্গে অসম্ভব সুন্দর আর চোখজুড়ানো সূর্যোদয়!
তা সেইসব দেখতেই তো এবারের গাড়োয়াল ভ্রমণে আসা। কয়েক মাস ধরে অনেক খোঁজখবর নিয়ে, রিসার্চ করে, আগে যারা এসেছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে বুকও করে ফেলেছিলাম সঞ্জয় সিং নেগি'র কার্তিকেয় প্যালেস। দুদিন হৃষিকেশে কাটিয়ে সকাল সকাল রওয়ানা হবার কথা ছিল কনকচৌরি। কিন্তু ক্যামেরার ব্যাটারির চার্জার গেল বিগড়ে!! তাই সকাল দশটায় হৃষিকেশে দোকান খুলতে একটা বিকল্প চার্জার কিনে তবে রওনা হওয়া গেল!
দীর্ঘ পথ যাত্রা করে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে চললাম কনকচৌরির পথে। আরও প্রায় ৩৮ কিমি। মাঝে শ্রীনগরে লাঞ্চ করার জন্য থামা হয়েছিল একবার।
বেলা পড়ে আসছে। সূর্য্য অস্ত যেতে বসেছেন প্রায়! দু-একবার গাড়ি থামিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করছি, যতটা সম্ভব কমই অবশ্য। কনকচৌরি থেকে কিমি দুয়েক আগে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে আমাদের পুত্র বমি করে দুপুরের খাবারদাবার সব তুলে ফেলল! বিহ্বল আর হতভম্ব লাগছিল তখন! নিজেকেই দোষী মনে হচ্ছিল। পাঁচ বছর বয়স থেকেই ছেলেটা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে! হঠাৎ কী হল! দুপুরের খাওয়াটা কি তবে ভাল ছিল না? এইদিকের খাওয়াদাওয়া সব নিরামিষ, যদিও বড্ড ঝালমশলা সমৃদ্ধ! সহ্য হচ্ছে না সেই হৃষিকেশ থেকেই! যাইহোক, ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে, চোখেমুখে জল দিয়ে আর ওষুধ খাইয়ে একটু চাঙ্গা করার চেষ্টা করলাম।

মিসেস ততক্ষণে রাগে অগ্নিশর্মা!! এবারের যাত্রায় যে পুরোটা না হলেও অনেকটাই হাঁটাপথ সেকথা ওদের বহুবার বুঝিয়েছি। তারপর ওরা গাঁইগুঁই করলেও আমিই জোরাজুরি করে আসতে বাধ্য করেছি। এরপরে আমার এই শখপূরণের ঠ্যালায় ছেলে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে... সেটা তো খুব খারাপ হবে।
মিনমিন করে মিসেসকে বুঝিয়েসুঝিয়ে ফের গাড়ি স্টার্ট করালাম। ওদিকে পাহাড়ে আর আকাশের গায়ে তখন অদ্ভুত রঙের খেলা! এক অপার্থিব দৃশ্যপটের রচনা হয়েছে। সূর্যের শেষ আলোয় রাঙা মেঘরাশির উপরে গোল থালার মত পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! তবে সেই স্বর্গীয় শোভা ক্যামেরাবন্দী করার জন্য ফের গাড়ি দাঁড় করানোর রিস্ক আর নিলাম না মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছাল কনকচৌরি গ্রামে।
খুব ছোট্ট,জবুথবু এক অজ পাড়াগাঁ। বেশি খুঁজতে হল না... একটু এগিয়েই পেয়ে গেলাম কার্তিকেয় প্যালেস। তবে প্যালেসসুলভ তো নয়ই... হঠাৎ করে দেখলে ভিরমি খেতে হয়। ছোট্ট একটা চায়ের দোকান, ওপরে হোর্ডিংয়ে লেখা "কার্তিকেয় প্যালেস"! দোকানের এক পাশে গুটিকয়েক বেঞ্চি আর টেবিল পাতা, আর একদিকে স্টোভ আর গ্যাস জ্বালিয়ে দশভূজার মত রান্নাবান্না, চা বানানো, ওমলেট ভাজতে ব্যস্ত ক্যাপমাথায় সদাহাস্যময় এক ব্যক্তি। ইনিই সঞ্জয় সিং নেগি, যাঁর সঙ্গে এর আগে মাত্র দুবারই হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছে রুম বুকিং করার সময়।
গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে বলতেই উনি শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন "আরে দাদা! আপ লোগোকা রুম রেডি হ্যায়! আইয়ে!" গাড়ির ডিকি থেকে মালপত্র নামিয়ে নিজেই পাশের খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নিয়ে এলেন। একটু নিচে পাশাপাশি দুটো ঘরের একটায় আমাদের আজকের আস্তানা গাড়ার কথা। লাগোয়া বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে এখানকার

বিরাজমান সেই পথের সঙ্গী পূর্ণচন্দ্র!
আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে নেগিজি ওপরে চলে গেলেন রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে। ওদিকে ঘরে ঢুকে মা আর ছেলে তখন পথের ক্লান্তি ভুলে রেগে অগ্নিশর্মা! খুবই ছোট্ট আট বাই আট-এর একটা ঘরের প্রায় পুরোটাই জুড়ে রয়েছে দুটো খাট। বাকি যা জায়গা রয়েছে,তার সবটাই দখল করে নিয়েছে লাগেজগুলো। ওরা রেগেমেগে বলল "এ কোথায় এনেছ? এ তো রীতিমতো অজ পাড়াগাঁ!"
আমার তখন পালাই পালাই অবস্থা। কোনোমতে ঢোঁক গিলে, আমতা আমতা করে বোঝালাম একটা রাত একটু কষ্ট করে কাটিয়ে নাও। কাল কার্তিকস্বামী মন্দির দর্শন করেই বেরিয়ে যাব উখিমঠ। নিমরাজি হল, তবে শর্ত দিল যে ওরা এই অসুস্থ শরীরে হাঁটাহাঁটি করতে পারবে না। মন্দির ট্রেকিং আমাকে একাই করতে হবে। ওরা এখানেই রেস্ট নেবে ততক্ষণ। আমি সেই শর্তেই রাজি তখন! বাঁচতে হবে তো আগে!
ওদের ঘরে একটু বিশ্রাম নিতে দিয়ে লাগোয়া বারান্দাটায় চলে এলাম চন্দ্রালোকিত রাতের কনকচৌরির ছবি তোলার চেষ্টা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। ক্যামেরা নিয়ে খুটখাট করতে থাকলাম। সকাল দশটায় বেরিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি সন্ধ্যা ছটায়। ঝুপ করে আঁধার নেমে এসেছে যেন। শুনশান চারিদিক। খুব কম জনবসতি এখানকার। রাত আটটার মধ্যে রাতের খাবার সেরে নেওয়া গেল। খুব হালকা করে ভাত (চাওল), অড়হর ডাল আর আলু-জিরা। সঞ্জয় সিং বলে গেলেন যে রাত সাড়ে তিনটে'র সময় আসবেন ডাকতে। হোমস্টে-এর আরও একটি ফ্যামিলির তিন জন যাবেন আর আমি। যাত্রা শুরু আগামীকাল ভোর চারটেয়। "শো যাইয়ে সাবজি"!
সঞ্জয় সিং-এর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। দরজা ভেতর থেকে আটকে শুয়ে পড়লাম। চুপচাপ শুয়ে সাতপাঁচ ভাবতে লাগলাম। কাল এতটা পথ চড়ে উঠতে পারব তো! নিজের ওপর সেরকম কনফিডেন্স নেই নিজেরই। ওরা তো কাল আর যাচ্ছে না! যাক একটু হলেও চিন্তা কমল। নিজে হাঁচোড়পাঁচোড় করে চড়ে যেতে পারব আশাকরি। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেশ সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম! খুব ঠান্ডা একটা জায়গা, বেশ উঁচুতে, আর প্রচুর ঘন্টা চারিদিকে। ঘন্টাগুলো একসঙ্গে টুং টাং করে যেন বাজছে... ওপরে খোলা আকাশ। ভোরের আকাশের মতন লালচে। তারপর আর কী যেন দেখলাম?

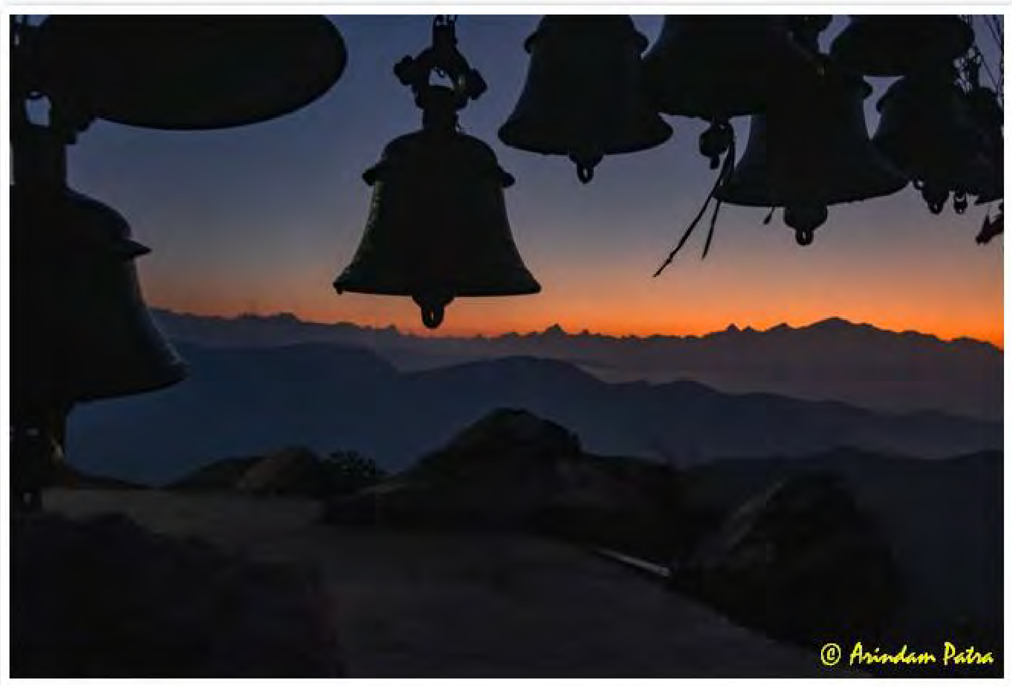

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মোবাইলের অ্যালার্মের রিংটোনের আওয়াজে। তাকিয়ে দেখি রাত তিনটে কুড়ি বাজে! আসলে ইন্টারনেটে আর পত্রিকার ছবিতে এত বার কার্তিকস্বামী মন্দিরের ওই ঘন্টাগুলো দেখেছি যে স্বপ্নেও পিছু ছাড়েনি ওই দৃশ্য। মনে মনে হেসে উঠে পড়লাম। হাতে আপাতত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট আছে। চোখেমুখে জল দিয়ে, ব্রাশ করে, একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম। বাকি দুজন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। গায়ে গরম জ্যাকেট আর মাথায় টুপি চাপিয়ে পিঠের ব্যাগে টুকিটাকি জিনিস, জলের বোতল ভরে নিলাম। আর অবশ্যই টর্চ!! ক্যামেরা তো আছেই!
পৌনে চারটে নাগাদ দরজায় খুব মৃদু টোকার আওয়াজ পেলাম। সঞ্জয় সিং প্রস্তুত। প্রত্যুত্তরে আওয়াজ দিয়ে ওঁকে আশ্বস্ত করলাম। আমাকে রেডি হয়ে আসতে বলে উনি ওপরে চলে গেলেন। তৈরি হয়ে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে ওপরে চলে এলাম। ওপরে এসে দেখি সঞ্জয় সিং আর তাঁর সহোদর ভাই রেডি। সঙ্গী হলেন ভোলানাথ ব্যানার্জি মহাশয় এবং ওঁর পরিবারের আরও দুজন সদস্য। ওঁরা ওপরের তলায় এই হোম স্টের একটি ঘরেই উঠেছেন। সকলের জন্য একটা করে লাঠির বন্দোবস্ত করে ফেললেন সঞ্জয়জি। উনি এবং ওঁর ভাইও সঙ্গে যাবেন।

হোম স্টের পাশ দিয়েই রাস্তা শুরু হয়েছে। সবাই মিলে হাঁটা শুরু করলাম। একটু এগিয়েই চড়াই ওঠা শুরু। রাস্তার বিশেষত্ব হচ্ছে খুব একটা খাড়াই না হলেও প্রচন্ড এবড়োখেবড়ো। আর ভোররাতের শিশিরে ঘাস খুব ভিজে রয়েছে। তাই

জানিওনা ছাই কোথায় পাওয়া যায়। ভগবানের নাম নিতে নিতে এগিয়ে চললাম লাঠি সম্বল করে। তবে পিঠের ভারী ব্যাগের দায়িত্ব আমাকে আর নিতে হচ্ছে না। সঞ্জয় সিং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পিঠের ব্যাগ আর ক্যামেরার ব্যাগ দুই-ই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আপত্তি জানাতে গেলাম, হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "আরে আপ শরমাইয়ে মাত! চলতে রহিয়ে।"
অগত্যা এগিয়ে যেতে থাকলাম। সঙ্গী ভোলানাথ বাবুর সঙ্গেও অনেক কথা হতে থাকল। ওঁরা পাকাপোক্ত ট্রেকার। এর আগে অনেকগুলো রুটে হেঁটেছেন। এবারেও এখানে এসেছেন কেদারনাথ ঘুরে। স্বভাবতই নভিশ আমি ওঁর সাহচর্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। মাঝে মাঝে লাঠি ফসকাচ্ছে নিচের জমি। তখন পা ব্যাকআপ কভারেজ দিচ্ছে। এই ভাবেই তিন ঠ্যাঙে ওঠা চলতে থাকল। মাঝেমধ্যে একটু দাঁড়িয়ে বা বসে বিশ্রাম আর দম নেওয়া। তারপর আবার হাঁটা শুরু।

চারিদিকে ঘন জঙ্গল আর প্রচুর গাছগাছালির সমাহার। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একমাত্র পাঁচটা টর্চের আলো জ্বলছে। পেছনে আরও দুটো-একটা দল ওঠা শুরু করেছে। হঠাৎ খেয়াল পড়ল অনেকদিন আগে, কোথায় খেয়াল নেই, পড়েছিলাম এক ভদ্রলোকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায়, উনি নাকি জংলি জানোয়ারের অস্তিত্বের আভাস পেয়েছিলেন আশেপাশে। তৎক্ষণাৎ সঞ্জয়জিকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা। উনি অবলীলাক্রমে বললেন, "হ্যাঁ, তা তো আছেই। জানোয়ার বলতে চিতা আর ভাল্লুকই আছে এদিকটায়।" শুনেই গলা শুকিয়ে কাঠ! ব্যাগ হাতড়ে জল খাব কিনা ভাবছি, উনি বলে উঠলেন, "লেকিন ঘাবড়ানা মাত! উওহ লোগ ইনসান দেখকে আশপাশ নেহি আতা!"
শুনে টেনশন কমল আবার কমলও না! যাইহোক কিছু করার নেই,এসেই যখন পড়া গেছে! মনে মনে পুরনো একটা গান গুন গুন করে গাইতে শুরু করলাম... "শোচনা ক্যায়া, যো ভি হোগা দেখা যায়েগা!" এতক্ষণে কতটা উঠেছি বুঝতে পারলাম না। সঞ্জয়জির ভাই সতীন্দর বললেন প্রায় দেড় কিমি উঠে এসেছি। মাঝে মাঝেই খাদের পাশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগের রাতের আলো তারার মত ঝিকমিক করছে। আরও একটা দলের সঙ্গে মাঝপথে দেখা হল। দলের দুজন বেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে এখন বাকিদের জন্য ওয়েট করছেন। হাই হ্যালো করে এগিয়ে চললাম। শুনলাম মন্দিরের বেশ খানিকটা আগে একটা চায়ের দোকান আছে। ওখানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাবে। দূর থেকে সম্ভবত সেই দোকানের আলোই দেখা যাচ্ছে। চলতে চলতে অনেকটা পথই পার হয়ে এসেছি। প্রথম প্রথম যতটা কষ্ট আর দমের ঘাটতি হচ্ছিল, এখন আর ততটা হচ্ছেনা।
ঘড়িতে এখন বাজছে চারটে পঞ্চাশ। চায়ের দোকানটা সামনেই। গাইডদ্বয় বললেন, "ওয়েল ডান"... মাত্র পঞ্চাশ মিনিটে অনেকটাই উঠে এসেছি। এরপর এখান থেকে মন্দিরের সিঁড়ি শুরু। প্রায় দেড়শো-দুশো ধাপ পেরিয়ে তবে পাহাড়ের মাথায় কার্তিকেয় দেবের মন্দির।
আমার আবার চা, কফি, সিগারেট কিছুই চলেনা। বাকিরা গলা ভেজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দোকানের সামনে বসে সঞ্জয়জির থেকে ক্যামেরার ব্যাগটা হাতবদল করে নিলাম। এইবারে আমার কাজ শুরু। এতদিন ধরে যে স্বপ্ন সযত্নে লালন পালন করে এসেছি, সেটা সফল করার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। সবাই হিসেব করলেন যে এখান থেকে ধীরেসুস্থে উঠলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আরামসে পৌঁছে যাওয়া যাবে। বলা হল সূর্যোদয়ের টাইম মোটামুটি ছটা থেকে সোয়া ছটা। সুতরাং অনেকটা সময় আছে হাতে!
মিনিট দশেক পরে সবাই চাঙ্গা হয়ে গাত্রোত্থান করলেন। এবার সিঁড়ি চড়ার পালা। খুব খাড়াই সেগুলো আর বেশ বড় বড়। দেখেশুনে পা ফেলে উঠতে হচ্ছে। পেছনের দু-তিনটে দলের গুঞ্জন আরো কাছে এসে পড়ছে। সব মিলিয়ে কতজন হবে তা অবশ্য জানিনা। আকাশের একটা দিক আস্তে আস্তে লালচে হয়ে উঠছে।

অবশেষে মন্দিরপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হওয়া গেল! ঢোকার মুখেই সেই সার সার ঘন্টার সারি ... রাতের স্বপ্নে যেগুলো মাঝেমধ্যেই আসে, যাদের ছবি কতবার দেখেছি নেটে আর ট্র্যাভেল ম্যাগাজিনে। বেশ বড় একটা চত্বরের মাঝে অবস্থান

ছটা পাঁচ...দশ...পনেরো... দিনের প্রথম আলো আস্তে আস্তে পুব দিগন্ত রাঙা করে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে সব কটি শৃঙ্গ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। কোনটা কী জানিনা! সঙ্গী দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি এক এক করে চিনিয়ে দিলেন সব। ভাগীরথী-১, ২, ৩, কেদারনাথ, কেদারডোম, নীলকন্ঠ, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, আর সবচেয়ে সহজে যেটা চেনা গেল তা হল চৌখাম্বা! তারপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! হাতি পর্বতের পিছন থেকে টুক করে মুখ বাড়িয়ে মাথা তুলল সূর্য। ভোরের আকাশ এক লহমায় মোহময় হয়ে উঠল। আবিরের রঙে যেন রক্তিম হয়ে উঠল গোটা আকাশ। পাঁচ-ছয় বছর পাহাড়ে বেড়াচ্ছি, খুব বেশিদিন নয়। এত ভাল সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য আগে হয়নি! দার্জিলিং-এর টাইগার হিল থেকেও সানরাইজ দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। তাই এই অপরূপ দৃশ্য চিরকাল মনে রাখব!

ক্যামেরার মেমোরি কার্ডে ততক্ষণে কম করে হলেও সাতশো ছবি বন্দী হয়ে গেছে। পকেট হাতড়ে দেখলাম তাড়াহুড়োয় মোবাইলটা ফেলে এসেছি। ভরসাস্থল হয়ে উঠলেন সেই সঞ্জয় সিং নেগি। ওনার মোবাইলে বেশ কয়েকটা সেল্ফি তুললাম দুজনে। তারপর মন্দিরে পূজারীজির কাছে পুজো দিয়ে, কপালে টীকা এঁকে ফিরে যাওয়ার পালা। ফিরতে গিয়ে ওই সিঁড়িগুলোর কাছে এসে মাথাটা ঘুরে গেল। খাড়াই সিঁড়ি আর পাশেই অতল খাদ। অন্ধকারে বোঝা যায়নি। ভয়ঙ্কর সুন্দর সেই দৃশ্য। খাদের পাশে সেই অসাধারণ সুন্দর প্রকৃতির মাঝে গাইড কাম হোমস্টে মালিককে বললাম, "দাদা, এক ফোটো হো যায়ে? দোনো হাত ফ্যায়লাকে এক সিগনেচার এস আর কে পোজ দিজিয়ে না!" সঞ্জয় সিং আমার কথামতো তাই করলেন আর আমিও খচাখচ ক্যামেরার শাটার চালালাম। ছবিগুলো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেব কথা দিলাম।
এরপর নেমে আসার পালা। নেগিজি বললেন একটু সামলে আর দেখে নিচে নামতে। কিন্তু তখন আর পায় কে! জীবনের প্রথম পায়ে হেঁটে পাহাড়চূড়োয় ওঠার অভিজ্ঞতা ছেলেকে শোনাতে যাওয়ার আনন্দে আমি তখন আত্মহারা! তাছাড়া নিচে নেমে রেডি হয়ে, ব্রেকফাস্ট সেরে চেকআউট করে রওনাও দিতে হবে। গন্তব্য উখিমঠ।

পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্রের নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কামাল পাশার শহরে

তপতী সাহা

রোমান, বাইজানটাইন ও অটোমান স্থাপত্য শিল্পের শহর ইস্তানবুল। হোটেলে ব্যাগেজ রেখেই বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে। পিয়েরে লোতি পাহাড় থেকে দুমিনিটের মধ্যে মজার কেবলকার চড়ে পৌঁছে গেলাম ঐতিহাসিক বসফরাস নদীর ফেরীঘাটে। ৩০ কিমি লম্বা ও ৪ কিমি চওড়া বসফরাস প্রণালী – প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গমস্থল। একদিকে এশিয়া আর অন্যদিকে ইউরোপ। নদীটি গিয়ে মিশেছে কৃষ্ণসাগরে। এর মোহনাই বিখ্যাত 'গোল্ডেন হর্ণ' - দেখতে হরিণের শিঙের মত। তুরস্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। খাঁড়িপথের মুখটি বিশাল শেকল দিয়ে আটকে রাখা যাতে অবাঞ্ছিত জাহাজ ঢুকে পড়তে না পারে।

একটা চমৎকার গন্ধে মনোজগতে বিচরণ থমকে গেল। ঝলসানো চেস্টনাটের সুগন্ধে ম ম করছে ঘাট। বাদাম খেতে খেতে বোটে উঠছি,দরজার মুখে একটা ছোট্ট প্যান্ট্রি চোখে পড়ল। স্তূপীকৃত টাটকা কমলালেবু। পাশে জুসারে জ্যুস হচ্ছে।আর একজন স্যান্ডউইচ বানাচ্ছে। নদীর পাড় জুড়ে রয়েছে অসাধারণ স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন – দোলমাবাচে প্রাসাদ, ব্লু মস্ক,

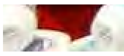

রয়েছে আপাদমস্তক কাঠের তৈরি চমৎকার অত্যাধুনিক বাংলো। কিছু লোক ছিপ ফেলে মাছ ধরছেন। চলন্ত বোটে তাজা কমলালেবুর রস ও অনন্য স্বাদের টাটকা মাছের স্যান্ডউইচ জীবনেও ভুলব না। নদীর ওপর উড়ন্ত সিগালের পাখায় নিভে এল দিনের আলো। অস্তমিত সূর্যের রং জলে পড়ে সোনালী আভায় ছেয়ে গেছে – চোখ ফেরানো মুশকিল। সার্থক নাম – 'গোল্ডেন হর্ণ'।

ইস্তানবুলে হাজার তিনেক মসজিদ রয়েছে। রমজান মাস সারাদিন দোকানপাট, হোটেল, রেস্তোঁরা খোলা। উদার হস্ত – প্রচুর সস্তায় খাবার ও পসরার ছড়াছড়ি। নেই কোনও ধর্মের গোঁড়ামি। ব্লু মস্ক বা সুলতানাহমেট (Sultanahmet) ইস্তানবুলের অন্যতম মসজিদ। নীল পাথরের কারুকার্যই শুধু নয়, ছটি অসাধারণ মিনার অন্য মসজিদগুলো থেকে এটিকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। একদিকে অটোমানদের এই শিল্পশৈলী আর তার মুখোমুখি বহু প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের বাইজানটাইনদের আয়া সোফিয়া (Ayasofya /Hagia Sophia) খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের।

ইতিহাস বলে প্রায় ২৭০ ফুট লম্বা ও ২৪০ ফুট চওড়া আয়া সোফিয়া গড়তে মিশরের আরটেনিস মন্দির ভেঙে আনা হয়েছিল একশ চারটি স্তম্ভ। বছর পাঁচেকের মধ্যে দাঙ্গায় আয়া সোফিয়ার অনেক ক্ষতি হয়। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমানদের কাছে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদ চার্চকে মসজিদে পরিণত করেন। তিনবার ভাঙা-গড়ার মধ্যেও আয়া সোফিয়ার গুরুত্ব কিন্তু এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক,তুরস্ক রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠাতা,আয়া সোফিয়াকে মিউজিয়ামে পরিণত করেন।আধুনিক তুরস্ক সারা পৃথিবীতে ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মর্যাদা পায়। একই ছাদের নিচে চার্চ ও মসজিদ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।আশ্চর্য হতে হয় সুদৃশ্য টাইলসের দেওয়ালে মাতা মেরি ও কোলে শিশুপুত্র আর চারদিক আলোকরা যিশুর ম্যুরাল পেইন্টিং দেখে।

পাথুরে রাস্তা পেরিয়ে 'ওবিলিক্স'-এর সামনে দাঁড়ালাম। ভাবতে অবাক লাগে, বিশাল উঁচু এই স্তম্ভটি রোম সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়স কিভাবে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে মিশরের ফারাওদের কর্নক মন্দির থেকে এনে ইস্তানবুলে স্থাপন করিয়েছিলেন! চোখের সামনে জীবন্ত ইতিহাস।

ওবিলিক্সের পাদদেশে অজস্র চেয়ার টেবিল পাতা ইফতারের জন্য। ইচ্ছে থাকা সত্বেও যোগ দেওয়া হল না গাইডের তাড়ায়। পৌঁছে গেলাম বহু পুরনো ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রান্ড বাজারে। বিশাল জায়গা জুড়ে দোকানপাট। পোর্সিলিন, কার্পেট, ঝাড়বাতি, মশলা, হরেকরকম খাদ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। কিন্তু হাতে এত কম সময় যে চোখধাঁধানো দুধারের দোকানে চোখ বোলানো ছাড়া উপায় ছিল না। কার্পেট, পোর্সিলিনের রং ও কারুকাজে মুগ্ধ হয়ে সময় একটু বেশিই লেগে গেল। হাতঘড়িতে চোখ পড়তেই বাস ধরতে ছুটলাম।

সম্রাট, সুলতানদের বিলাসবহুল প্রাসাদ 'টোপকাপি'। নির্মাণপর্ব শেষ হয়েছিল ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র তেইশ বছরের অটোমান সুলতান প্রাসাদটিকে নিজের বাসস্থানই শুধু নয়, প্রশাসনিক দপ্তরও বানিয়েছিলেন। প্রায় চারশো বছর ধরে চলেছিল এই ব্যবস্থাপনা। পরবর্তীকালে এই প্রাসাদে নিত্যযাপনের আধুনিক ব্যবস্থা না থাকায় 'দোলমাবাচে' প্রাসাদটি তৈরি হয়। এ নামের অর্থ 'বাগানে পরিপূর্ণ'। সত্যিই তাই! বসফরাসের দুরন্ত হাওয়া আর ম্যাগনোলিয়ার অপূর্ব গন্ধ মাতিয়ে রেখেছে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ। প্রাসাদের প্রতিটি তলায় রয়েছে স্থাপত্যশিল্পের চমক এবং অত্যাধুনিক নিত্যযাপনের আরামদায়ক ব্যবস্থা। দর্শনীয় ক্রিস্টালের সিঁড়ির রেলিং আর রানি ভিক্টোরিয়ার দেওয়া উপহার সাতশো পঞ্চাশটি আলোর বিশাল ঝাড়বাতি।

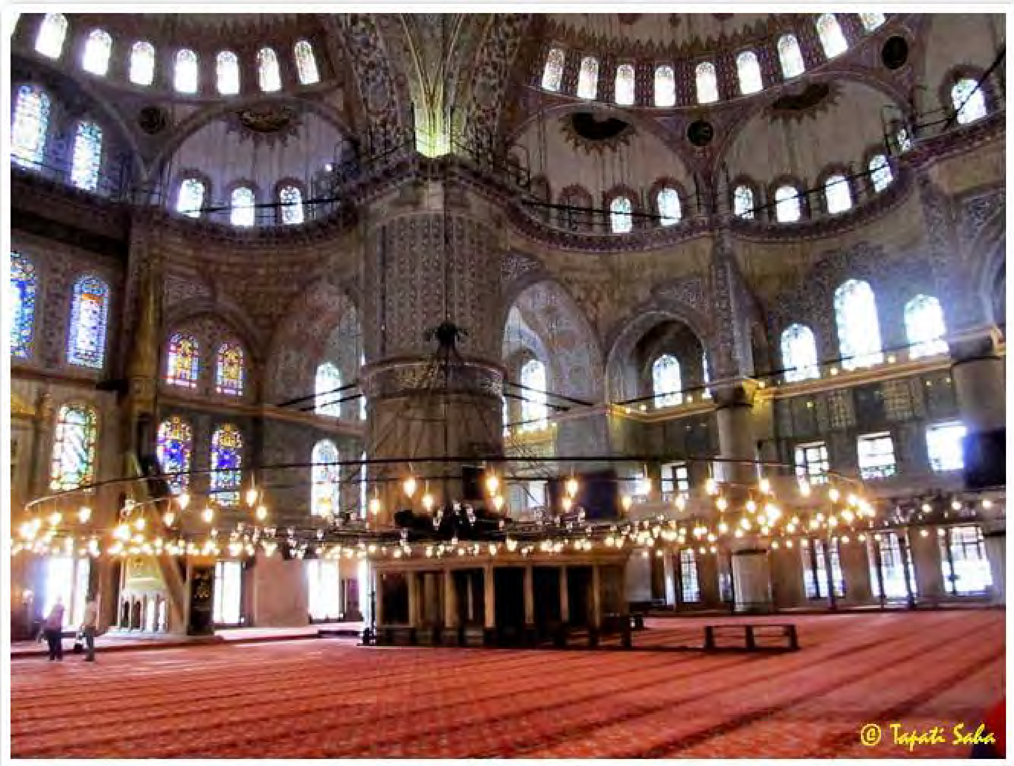

তুরস্কের স্বাধীনতাসংগ্রামী বীর যোদ্ধা কামাল আতাতুর্ক গ্রীষ্মকালে এই প্রাসাদে থেকে তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর ঘরটির সামনে দাঁড়াতেই গায়ের রক্ত টগবগিয়ে উঠল। আপনমনেই বলে উঠলাম - 'দস্যুগুলোয় সামলাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই / কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই! / হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!'

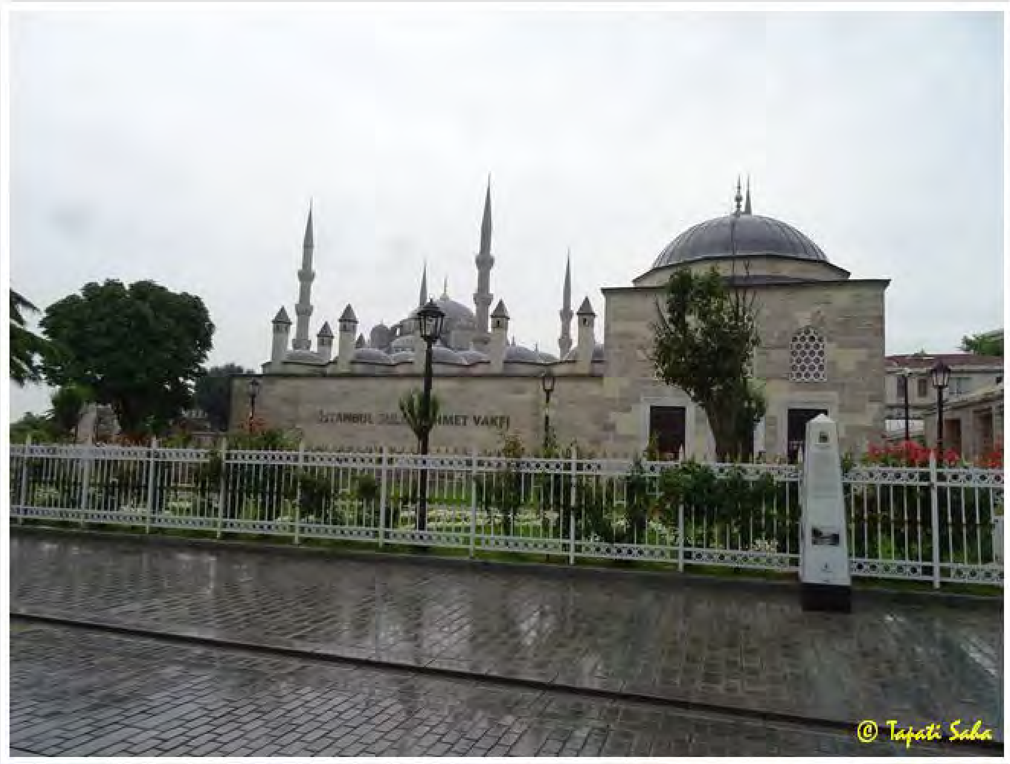

দিনের শেষে জিরোতে এলাম টাক্সিম স্কোয়ারে। সামনেই 'স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি-সৌধ'। সব ক্লান্তি উধাও। অনেকটা দার্জিলিং ম্যাল মনে করিয়ে দেয়।

সামান্য নেমে দোকান, বাজার। রকমারি খাবারদাবার। মনোলোভা 'বার্কলাভা', অমনটি আর কোথাও খাইনি। প্রাণভরে খেলাম বেশ কয়েকটি টার্কিশ পদ ও মিষ্টি। মনোরম পার্কে বসে দেখছি, খানিক দূরে, রাস্তায় ছোট্ট ট্রাম এঁকেবেঁকে চলেছে, অসংখ্য পায়রা চত্বরে দানা খুঁটে খাচ্ছে, মায়েরা শিশুদের নিয়ে চলন্ত দোকানে খাবার কিনছে – যেন মেলা বসেছে।

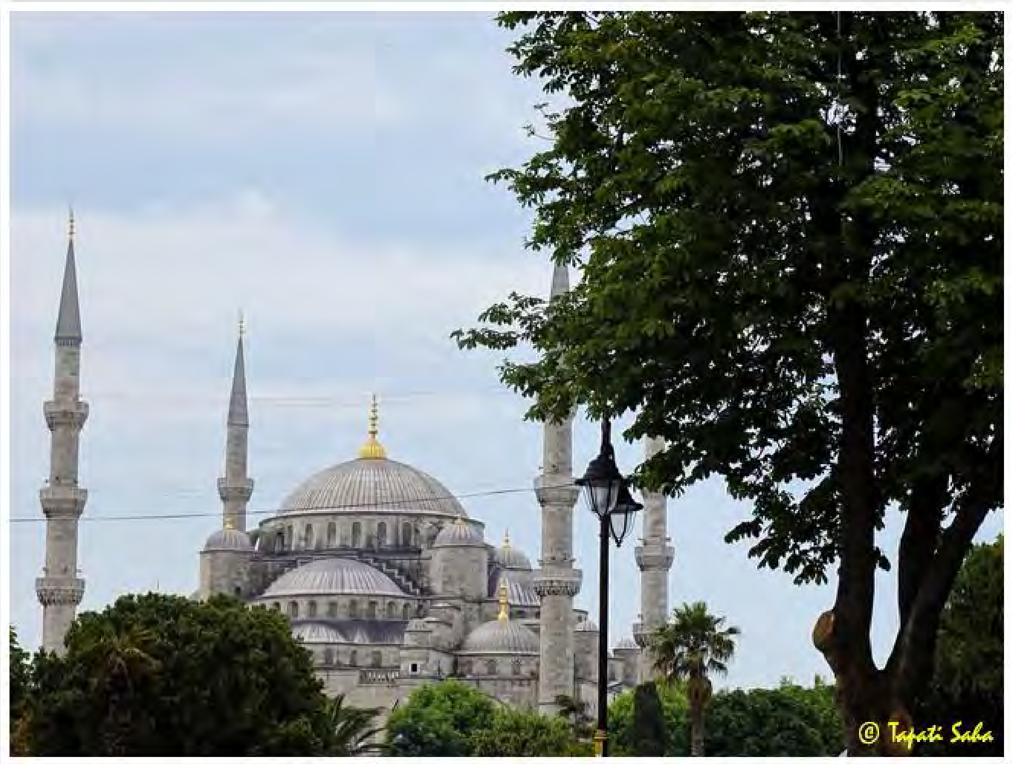

বাচিক শিল্পী, চিত্রনাট্যকার ও প্রাবন্ধিক তপতী সাহা বর্তমানে স্কুল অব সোস্যাল ওয়ার্ক এ্যান্ড কমিউনিটি সার্ভিস, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অনারারি কো-অর্ডিনেটর এবং শিক্ষক। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থায় সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ছিলেন।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

এস্টোনিয়ায় একদিন

সৌমিত্র বিশ্বাস

এস্টোনিয়ার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ছিল না আমাদের, কিন্তু ট্র্যাভেল এজেন্ট বললে, 'হেলসিঙ্কিতে চারদিন থাকবেন যখন, একদিনের জন্য অন্তত ট্যালিন (এস্টোনিয়ার রাজধানী) ঘুরে আসুন, আমি যাতায়াতের ফেরির টিকিটের ব্যবস্থা করে দেব।' তথাস্ত, অতঃপর ইন্টারনেট ঘেঁটে পড়াশোনা করে ট্যালিন যাওয়ার জন্য উদগ্রীব প্রতীক্ষা! অবশেষে এক বৃষ্টিভেজা শুক্রবার সকালে হেলসিঙ্কির ওয়েস্ট হারবার টার্মিনাল দুই-এ পৌঁছাই দুজনে, সাড়ে দশটার ফেরি ধরতে ট্যালিনের উদ্দেশ্যে। অগ্রিম বুকিংয়ের প্রিন্ট-আউট ও পাসপোর্ট দেখাতেই টিকিট কাউন্টারের মহিলা হাসিমুখে যাতায়াতের দুজোড়া বোর্ডিং পাস হাতে ধরিয়ে দেন। সওয়ার হই 'মেগাস্টার' নামে এক জাহাজে ।

ফেরি বললে ঠিক বোঝানো যাবে না – বারোটি ডেক-এ আঠাশশো যাত্রী আর অনেকগুলি বাস, ট্রাক ও গাড়ি বহনকারী 'মেগাস্টার' এক সুবিশাল প্রামোদতরী বিশেষ। জাহাজের খোলে ঢুকে যায় গাড়িগুলো আর ওপরের ডেকগুলিতে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা । প্রতি ঘন্টায় ২৭ নট (প্রায় ৫০ কিমি) গতিতে 'মেগাস্টার' চালায় ৪০,৬০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন প্রাকৃতিক গ্যাসচালিত এক পরিবেশ বান্ধবইঞ্জিন! চারটি রেস্তোঁরা, একটি কাফেটেরিয়া ও দুটি বার ছাড়াও জাহাজে রয়েছে ২৮০০ বর্গমিটারের এক 'সুপার মার্কেট' এবং আরও দুটি স্যুভেনির শপ ও কনফেকশনারি।

নিয়ে,অভ্যন্তরের নানা অংশের ছবি তুলে রাখি – ঘুরে বেড়াই এক থেকে অপরপ্রান্তে। ক্লান্ত হয়ে একসময় বসে পড়ি রেস্তোঁরার দুটি খালি চেয়ারে। হেলসিঙ্কি ছেড়ে 'গালফ অফ ফিনল্যান্ড' অতিক্রম করে ঘণ্টাদুয়েক পর জাহাজ ট্যালিন পৌঁছয়।

স্থানীয় ভাষায় ট্যালিন-এর অর্থ ডেনিশ শহর – এস্টোনিয়ার একেবারে উত্তরে অবস্থিত এ শহরের প্রাচীন নাম ছিল 'রেভাল'। সেখানে বসবাস করতেন জার্মানি, ডেনমার্ক ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের উচ্চবিত্ত ব্যবসাদাররা। ট্যালিন-এর পুরোনো অংশ 'ওল্ড টাউন' নামে পরিচিত, সেটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের সাক্ষ্যবহনকারী। অতি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত সুপ্রাচীন শহরটি ইউনেস্কো-র 'বিশ্ব ঐতিহ্যভূমি' (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) হিসাবে স্বীকৃত। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত অট্টালিকাগুলি গথিক স্থাপত্যের, ষোড়শ শতাব্দীরগুলি রেনেসাঁস শৈলীর আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরি বেশ কিছু ভবন বারোক স্থাপত্যের চিহ্ন বহন করে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে জার্মান সেনাবাহিনী এস্টোনিয়া থেকে সরে গেলে রাশিয়ার রেড আর্মি দখল নেয় দেশটির। ১৯৪৪ সালে এস্টোনিয়া যুক্ত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য হিসাবে। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের পর ১৯৯১ সালের ২০ আগস্ট এস্টোনিয়া পায় স্বাধীনতা; ২০০৪ সালে সদস্য হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর ২০১১ সালে অন্তর্ভুক্ত হয় ইউরোজোন-এর। বর্তমানে এস্টোনিয়ার অর্থনীতি বেশ তুঙ্গে,নাগরিকদের গড়পড়তা আয় বছরে প্রায় তিরিশ হাজার ইউরো। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে মাথাপিছু স্টার্ট-আপ-এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলে এস্টোনিয়াকে বলা হয় 'ইউরোপের সিলিকন ভ্যালি'। সুবিখ্যাত ভিডিও কম্যুনিকেশন সফটওয়্যার 'স্কাইপ'সহ আরো বেশ কিছু বহুলব্যবহৃত সফটওয়্যার প্যাকেজ-এর জন্মস্থল এস্টোনিয়ায়। ন্যাটোর সাইবার সিকিউরিটি ডিফেন্স সেন্টার ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা অবস্থিত ট্যালিন-এ। বিশ্বের প্রথম দশটি ডিজিটাল শহরের মধ্যে ট্যালিন তার পাকা জায়গা করে নিয়েছে।

জাহাজ ট্যালিন পৌঁছলে দেখি প্রকৃতিদেবী সদয় হয়েছেন, মেঘ-বৃষ্টি সরে গিয়ে ঘননীল আকাশে সূর্যের ঝিলিক। মহানন্দে বেরিয়ে পড়ি প্রাচীন ট্যালিন-এর উদ্দেশ্যে, পথনির্দেশ অনুসরণ করে প্রায় দেড় কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছে যাই পুরনো শহরের প্রবেশদ্বারে। রাস্তায় পেরোতেই সবুজ ঘাসের গালিচামোড়া এক উদ্যান – বেশ কয়েকটি মহীরূহ বসন্তের আগমনে কচি পাতায় সজ্জিত, কিছু গাছ আবার রঙবেরঙের ফুলের ভারে অবনত। পার্কে ব্রোঞ্জনির্মিত আধুনিক সব ভাস্কর্য। পুরনো শহরের প্রবেশদ্বারে ফুলের বাজার – নানা বর্ণের, নানা বৈচিত্র্যের ফুলের সম্ভার, চোখধাঁধানো টিউলিপের ছড়াছড়ি চারিদিকে। নিমেষে মন ভালো করে দেওয়ার এক মোক্ষম দাওয়াই।

দুটি ছোট মিনার (Turret) প্রবেশদ্বারের দুইপাশে, ভেতরে ঢুকে আবিষ্কার করি এক স্বপ্নরাজ্য। পাথরের (Cobblestone) রাস্তা, দুধারে সুরম্য প্রাচীন অট্টালিকাসমূহ, কিছু বাড়ির কেন্দ্রে প্রশস্ত উঠোন। প্রধান সড়কে এসে মিশেছে উত্তর কলকাতার গলির মত সরু রাস্তা, সেখানেও একের পর এক বাড়ি – অপরূপ তাদের স্থাপত্য। আর্চ-আকৃতির দরজা-জানালা ও অলঙ্কৃত অলিন্দ নিয়ে যায় স্থাপত্যের এক মায়াবী জগতে। এক পরমাশ্চর্য পরিবেশ – সময় যেখানে থমকে গেছে সাতশ বছর আগে। পুরনো শহরে পাব আর ক্যাফেটেরিয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে আর আছে বিশ্বের নানা দেশের রান্নাঘর নিয়ে অগুন্তি রেস্তোঁরা। এছাড়াও রয়েছে অজস্র বুটিক – সিরামিক, টেরাকোটা, ক্রিস্টাল, পাথরের তৈরি দ্রব্যাদি, ছুরি-কাঁটা ও কাচের বাসনকোসন, নয়নাভিরাম পুতুলের দল, স্থানীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি, ক্রুশের কাজ করা বিছানার চাদর থেকে মহিলাদের স্টোল ও স্কার্ফ,হাতেবোনা মোজা – হস্তশিল্পের এক অফুরন্ত প্রদর্শনী! আঙুল ব্যস্ত হয় ক্যামেরার শাটারে, ধরে রাখি চারিপাশের নানা দৃশ্যপট মুগ্ধ বিস্ময়ে।

ধীরে ধীরে পৌঁছে যাই পুরোনো শহরের কেন্দ্রে এক পাবলিক প্লাজা বা সুবিস্তীর্ণ চত্বরে – সেখানেও নানান হাতের কাজ ও স্যাভেনির শপ - পরিচালনায় এস্টোনিয়ান মহিলারা, দলে দলে বিদেশি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে ভিড়ে যাই স্যাভেনির সংগ্রহে।

সঙ্গীতের মূর্ছনা আর তাঁদের দলের চার তন্বী লোকনৃত্যে মাতিয়ে তোলেন দর্শকদের – ট্যুরিস্টরা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে উপভোগ করেন সে প্রাণোচ্ছল পরিবেশন। কিছুক্ষণ পর পেটে খিদের মোচড়, সেন্ট্রাল প্লাজার একটি রেস্তোঁরায় 'ফিস অ্যান্ড চিপস' ও এস্টোনিয়ান ড্রাফট বিয়ার দিয়ে সারি আমাদের মধ্যাহ্নভোজন।
ক্লান্ত পদক্ষেপে ফিরে চলি জাহাজঘাটার দিকে – সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ছাড়ে ফিরতি ফেরি। জাহাজের 'ডিলাইট ব্যুফে' নামের রেস্তোঁরায় মেঝে থেকে ছাদ অবধি কাচেঢাকা জানালার পাশের টেবিলে বসে পড়ি। ব্যুফে ডিনারের খাদ্যতালিকা থেকে যে কাকে ছেড়ে কাকে বাছি – বিভিন্ন আমিষ ও নিরামিষ স্যালাড, আরবদেশের হামাস, নানা রকমের বাদাম, কোরিয়ান স্যালাড - কিমচি, নরওয়েজিয় পিঙ্ক স্যামন,বল্টিক হেরিং, দু-তিন রকমের চিংড়ি, বড় ঝিনুক, মুরগির মাংসের তিন-চার রকমের পদ, বিফ, পর্ক, অন্তত পাঁচ/ছয় রকমের নিরামিষ সবজি, চাইনিজ ন্যুডলস, বাসমতী চালের ভাত এসব মিলিয়ে এক এলাহি ব্যাপার - এরপর আবার ডেজার্টের এক বিশাল কাউন্টার! আর কল খুলে ভরে নাও রেড ওয়াইন, হোয়াইট ওয়াইন ও বিয়ারের গ্লাস যত ইচ্ছে...
সন্ধ্যা সাড়ে নটায় হেলসিঙ্কির বন্দরে ভিড়ল আমাদের জাহাজ। দুই পা তখন বিদ্রোহী, কিন্তু মন টইটুম্বুর ট্যালিনের রূপবৈচিত্র্যে!

সৌমিত্র বিশ্বাস পেশায় কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ার। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকে সুদীর্ঘ আঠাশ বছর কর্মজীবনের পর বর্তমানে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিতে (সি-আই-আই) কর্মরত। কর্মসূত্রে পৃথিবীর বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। বিশেষ শখ আলোকচিত্রগ্রহণ।

Comments

Name

Enter your comment here

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

রূপনারায়ণের কূলে শরৎ কুঠি

বাপ্পাদিত্য বর্মন

এক ছুটির দিনে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দেউলটির পথে। উদ্দেশ্য 'শরৎ স্মৃতি মন্দির' আর রূপনারায়ণ নদী। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজরিত দেউলটি গ্রামে রয়েছে তাঁর বসতবাড়ি।
কলকাতা থেকে গাড়িতে দেড় ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় হাওড়া জেলার শেষপ্রান্তে দেউলটিতে। হাওড়া স্টেশন থেকে দক্ষিণপূর্ব রেলের প্রায় সব লোকাল ট্রেনই দেউলটি যাচ্ছে। তবে আমরা গাড়িতেই গিয়েছিলাম।
ঝকঝকে সকালে তরতাজা মনে রওনা দিলাম দেউলটির সমতাবেড় গ্রামের পথে। জাতীয় সড়ক ছেড়ে দেউলটিতে ঢুকলে মিষ্টি রোদমাখা রাস্তার দুপাশে হলুদে সবুজে মেশা অপরূপ প্রকৃতির দেখা মিলল।
সুন্দর পথনির্দেশ দেওয়া রাস্তা দিয়ে পৌঁছে গেলাম 'শরৎ স্মৃতি মন্দির'। লেখকের ছোট দোতলা বাড়ির প্রবেশদ্বারের ওপর বোগেনভিলিয়ার গোলাপী নকশা। স্তম্ভে লেখা আছে 'মহেশ'-এর বিখ্যাত উক্তি।

বাড়িতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নানান কাহিনির ঘটনা,চরিত্রগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সামনের পুকুরে নাকি 'কার্তিক', 'গণেশ' নামে মাছ পুষেছিলেন লেখক। 'রামের সুমতি'র পেয়ারাগাছটি এখন মৃত, তাঁর বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে।
দোতলা বাড়িটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে লেখকের স্মৃতি। ধানের গোলা, কাঠের বারান্দা, লেখার টেবিল, ঘড়ি, বইয়ের তাক সবকিছু সংরক্ষিত পরম যত্নে। এক কালে অনেক গুণী মানুষের পদধূলি পড়ত এই বাড়িটিতে। বাড়িটি দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা দুজন খুব ভালো করে দেখালেন সমস্ত কিছু। বাগানটিও সুন্দর গাছ-গাছালিতে সাজানো।
পল্লী-প্রকৃতির লেখক তাঁর বসতবাড়িটি তৈরি করেছিলেন প্রকৃতির মাঝে। সেই সময়ে বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যেত রূপনারায়ণ নদী। জানলা দিয়ে নদীকে অনুভব করতেন লেখক। এখনো ওপরের বারান্দায় কাঠের রেলিঙে ভর দিয়ে সামনে দেখা যায় রূপনারায়ণ। শরৎচন্দ্র 'অভাগীর স্বর্গ' লিখেছিলেন এখানেই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রূপনারায়ণের পাড়ে। রূপনারায়ণের নামের সঙ্গেই যেন লুকিয়ে আছে তার সৌন্দর্য। সোনালি বালির চর আর নদীর প্রেক্ষাপটে সবুজ বনানীর মনভোলানো দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। নদীর পাশে ফুটে থাকা সর্ষেফুলের ক্ষেতে হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। জনপ্রিয় পিকনিক স্পটও এই রূপনারায়ণের পাড়।
দূরে কোলাঘাটের শরৎ সেতু। ওপারে পূর্বমেদিনীপুর, এপারে হাওড়া, আর নদী যেখানে একটু বাঁক নিয়েছে সেখানে পশ্চিম মেদিনীপুর। এই তিন জেলার সন্ধিস্থলে রূপনারায়ণের কূলে ঘাসের ওপর বসে সামনে দেখা যায় ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ গাভীর মত চরে বেড়াচ্ছে। বিশালাকার বালিচর নদীর বুকে উঁচিয়ে আছে। যেন ঘোষণা করছে নদীর মৃত্যুঘন্টা। তবু তার কোন অভিযোগ অনুযোগ নেই কারো কাছে। তার ক্ষুদ্র সম্পদ নিয়ে বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে।

কয়েকটি মাছ ধরার ডিঙি নৌকা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে সেদিকে। আর বালি বোঝাই বড় বড় নৌকাগুলো গভীর জলের সঠিক পথ খুঁজে চলেছে সওদার জন্য। বিকেলের রাঙা আলোর রেশটুকু গায়ে জড়িয়ে দিব্যি সেজেছে প্রকৃতি। বসে থাকলাম সূর্যাস্তের জন্য। আকাশ, নদী, পাড় সবই রাঙা হয়ে উঠল। একটু একটু করে নিচে নামছে সূর্য। নদীর জলে তার ছায়া। সোনালি সেই ছায়া ধীরে ধীরে লাল হচ্ছে। জলের বুকে যেন শিল্পীর তুলির টান। সূর্যের রঙও সোনালি থেকে সিঁদুর হল। রঙের মেলায় দৃশ্য কেবলই বদলে যাচ্ছে।
কূলে বসে থাকলে কখন যে সময় কেটে যাবে তা বোঝা যাবে না। এবারে ওঠার পালা। তবু যেতে ইচ্ছা করে না।

গ্রামে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে অনেকগুলি নার্সারি। ফেরার পথে ঢুকে পড়লাম তার কয়েকটিতে। চোখধাঁধানো সব ফুলের গাছ,ঘরসাজানোর গাছ, দুর্লভ অর্কিড, ক্যাকটাস দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। অতি যত্নে ফোটানো ফুলসহ ক্যাকটাস দরদাম করে বাড়ির জন্য নিয়ে আসা যেতেই পারে। আছে বাহারি ফলের গাছও। গাছপালা নিয়ে যারা চর্চা করেন তাদের জন্য আদর্শ জায়গা এই নার্সারিগুলো। গাছগাছালির মধ্যে বেশ অনেকটা ভালো লাগার সময় কেটে গেল।

পেশায় স্কুল শিক্ষক বাপ্পাদিত্য বর্মন-এর শখ বেড়ানো আর বই পড়া।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher